

ঔপনিবেশিক বাংলায় টোলকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার বিবর্তন : সংস্কৃতচর্চার বহুমাত্রিকতা এবং ‘আধুনিক’ বাঙালী মনন

প্রীতম গোস্বামী

সারসংক্ষেপ

বাংলার ইতিহাসের মধ্যযুগ থেকে আদি আধুনিক ও আধুনিক যুগ পর্যন্ত দেশজ সংস্কৃত শিক্ষাপদ্ধতির অঙ্গাদী অংশ হিসাবে টোল শব্দটির উল্লেখ আমরা পাই। টোল যা চতুষ্পাঠী বা সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্রের সমার্থক শব্দ তা বাংলায় দীর্ঘকালব্যাপী বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদী শিক্ষাধারার প্রধান বাহক ছিল। সাধারণ কর্মক্ষেত্রে ফার্সী বা আরবী ভূমিকা থাকলেও প্রাক ঔপনিবেশিক বা আদি ঔপনিবেশিক যুগে বাংলার গ্রামগুলিতে (এবং ছোট শহরগুলিতেও) টোলশিক্ষার যে ধারা ছিল এবং সেই টোলে শিক্ষার পরবর্তী কালে নবদ্বীপ, মিথিলা, ত্রিছত এবং বারানসীতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের যে ব্যবস্থা ছিল তাই ছিল বাংলাদেশে প্রাচ্য জ্ঞানবাদী ক্ষেত্রটির চর্চার মেরুদণ্ড স্বরূপ। বিশেষীকরণ এবং অধ্যাপকের বিশেষজ্ঞতার তারতম্যের ভিত্তিতে এই টোলগুলিতে ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, পুরাণ, ষড়দর্শণ, স্মৃতিশাস্ত্র, ভক্তিশাস্ত্র, তন্ত্রশাস্ত্র, বৈদ্যক শাস্ত্র, গণিত-জ্যোতিষ এমনকি বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনেরও চর্চা হত। যদিও বেদের কর্মকাণ্ড শাখার চর্চা প্রায় ছিল না এবং বেশীরভাগ টোলই ব্যাকরণ, ন্যায়শাস্ত্র এবং স্মৃতিশাস্ত্র চর্চাতেই আবদ্ধ ছিল তৎসত্ত্বেও পাঠগত বিষয়ের অভিনবত্ব কম ছিল না। ঔপনিবেশিক যুগে mercantile capitalism এর পরোক্ষ উপহার আধুনিক পাশ্চাত্য এবং ‘secular bourgeois’(?) শিক্ষারফলশ্রুতিতে bourgeois morale (অবশ্যই খণ্ডিত ও সংশয়দীর্ণ) স্বাক্ষর এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হয় যাদের জাগতিক ও জ্ঞানমার্গী প্রয়োজন মেটাতে টোলব্যবস্থা অক্ষম ছিল। সাধারণ সিদ্ধান্ত এই যে একাধারে এই ঔপনিবেশিক অর্থনীতির ধাক্কা যার ফলে অর্থনৈতিক জীবন ও জীবিকার পরিবর্তিত সম্পর্ক ও অন্যদিকে নূতন জ্ঞান ও চিন্তনজগতের বিস্তার এরই দ্বিমুখী ফলশ্রুতিতে টোলব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। এই প্রবন্ধে আমরা টোলকেন্দ্রিক বিদ্যাচর্চার বিভিন্ন ধারাগুলির বিশ্লেষণের পাশাপাশি দেখাতে চেয়েছি যে পরিসংখ্যানগত ঐতিহাসিক উপকরণে টোলব্যবস্থার অবস্থান এবং প্রভাব অনুধাবন সম্ভব নয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্তও টোলের প্রভাব ছিল যথেষ্ট এবং তা গুণগত দিক থেকে প্রভূত প্রভাব এবং ঔপনিবেশিক শিক্ষাগত বাস্তবতার বিকল্প নির্মাণে সহায়তা করেছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে Charles Wood-এর dispatch অনুসারে শিক্ষার infiltration পদ্ধতিতে গ্রাম ও মফঃস্বল অঞ্চলে ইংরাজী প্রাইমারী স্কুল, নর্ম্যাল স্কুল, বেঙ্গলী স্কুল এবং অ্যাংলো-ভার্নাকুলার স্কুলগুলি বিস্তার লাভ করায় টোলশিক্ষার শিকড়গত ক্ষেত্রে টান পড়ে ও যে পদ্ধতির হোতা ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ কিছু সংস্কৃত পণ্ডিতরাই যা সংস্কৃত শিক্ষার ‘ভিতর থেকে পরিবর্তনের’ ইঙ্গিত দেয়। এই প্রবন্ধে আমরা এই জটিল মিথস্ক্রিয়ারই আলোচনার চেষ্টা করেছি। টোলধারী পণ্ডিতদের নিজেদের অস্তিত্ব সঙ্কট এবং টোল এবং পাঠশালার পারস্পরিক

নির্ভরশীল আবার সময়বিশেষে বিপরীতমুখী সম্পর্কেরও আলোচনা করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক জটিলতা এবং খণ্ডিত আধুনিকতার প্রেক্ষাপটে টোল ব্যবস্থার এই প্রভাব, ভাঙন ও বিবর্তনের চর্চাই বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের উপজীব্য।

সূচকশব্দ : টোল, সংস্কৃতচর্চা, বানিজ্যিক পুঁজিবাদ, মেকলে মিনিট, অ্যাংলো-ভার্নাকুলার স্কুল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বাংলাদেশে প্রাক ঔপনিবেশিক যুগ থেকে বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত দেশজ শিক্ষা বিশেষতঃ সংস্কৃতাদ্যায়নের সঙ্গে ‘টোল’ শব্দটি অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। এখনও গ্রামবাংলার বহু পরিত্যক্ত জমি ‘টোলবাড়ীর ভিটা’ নামে পরিচিত। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত বঙ্গীয় শব্দকোষে টোল শব্দটির অর্থ দেওয়া হয়েছে ‘সংস্কৃতপাঠশালা, চতুষ্পাঠী’(বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৪৪ বঙ্গাব্দঃ ১৩৬২)। বৈদিকযুগে এবং পরবর্তীকালে চতুর্বেদ সুদীর্ঘকাল ধরেই সংস্কৃতচর্চার প্রধান বিষয়বস্তু হওয়ায় বিদ্যাকেন্দ্রগুলি চতুষ্পাঠী নামেই পরিচিত হয়। বাংলায় আদি মধ্য যুগ থেকেই বেদের চর্চা খুব বেশী না হলেও টোল এবং চতুষ্পাঠী অভিন্নার্থে ব্যবহৃত হত। এই টোলবাটীগুলিতে জ্ঞানচর্চার বিষয়গুলির মধ্যে টোলধারী অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যরা মূলতঃ ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার ও ন্যায় এবং এছাড়াও পুরাণ, জ্যোতিষ, বেদান্ত (যদিও তার সংখ্যা খুবই নগণ্য), স্মৃতি ও তন্ত্র শিক্ষা দিতেন। এই পণ্ডিতরা তাঁদের বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞতার ভিত্তিতে নিজস্ব উপাধি গ্রহণ করতেন। প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে এই টোলগুলি যে বাংলার স্বাভাবিক জ্ঞানচর্চার ও শাস্ত্রালোচনার কেন্দ্ররূপে স্বকীয় ভূমিকা পালন করছিল সেগুলি ব্রিটিশ শাসনপর্বে ঔপনিবেশিক শিক্ষার বিস্তারে ও অর্থনৈতিক জ্ঞানচর্চাগত মূল্যমান পরিবর্তনের ফলে বহুত্মাত্রায় ভাঙনের শিকার হয়। এই পরিবর্তন ও ভাঙনের বিবরণ ও কারণকেই আমরা বিশ্লেষণ করব এই প্রবন্ধে।

টোলব্যবস্থার বিদ্যাচর্চার ধারা ও তার সীমাবদ্ধতার ব্যাখ্যার জন্য এই প্রবন্ধে একদিকে যেমন ঔপনিবেশিক বাংলায় পাশ্চাত্য secular বিদ্যাচর্চার কথা আলোচিত হয়েছে। তেমনি টোলের সংস্কৃত শিক্ষার পাশাপাশি ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠানে (সংস্কৃত কলেজ ও এশিয়াটিক সোসাইটি) এবং কাশীর সংস্কৃতচর্চার বিভিন্নতার কথা আলোচিত হয়েছে। বাংলার টোলকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা কেবলমাত্র বৃত্তি-নিমন্ত্রণলোভী পুরোহিত ও অধ্যাপক শ্রেণীর উৎপাদনের যন্ত্র ছিল না। সংস্কৃত ভাষা ও সেই ভাষায় রচিত সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, যড়দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসাশাস্ত্র, আইন (স্মৃতিশাস্ত্র) ভক্তিশাস্ত্র এমনকি বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনচর্চার দেশজ মাধ্যম এবং দেশজ প্রতিষ্ঠান ছিল এই টোলগুলি। ঔপনিবেশিক যুগে একদিকে পাশ্চাত্য secular বিদ্যাচর্চার অভিঘাতে প্রাচীন টোলধারী শিক্ষা তার গুরুত্ব হারায় এবং পাশ্চাত্য indology-র ধারায় আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষিতরা নূতন জ্ঞানার্জনী (cognitive) পদ্ধতিতে সংস্কৃতবিদ্যার ব্যাখ্যা করতে থাকেন। এশিয়াটিক সোসাইটিতে indology-র নির্মাণে পণ্ডিতদের শুধু অনুবাদক ছাড়া কিছু ভাবা হয় না। (Hatcher ২০০৫: ৬৮৩-৭২৩)। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে বাঙালী হিন্দুধর্ম ও সমাজের নবব্যাখ্যাকাররা টোলের ‘ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত’দের সম্পর্কে কঠোর উক্তি করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্পষ্টতই বলেন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আখ্যা তিনি অপমানকর জ্ঞান করেন (বিদ্যাসাগর ১২৯১ বঙ্গাব্দঃ ১৩)। অপরদিকে mercantile capitalism-এর যে আঘাত পেশাগত এবং উপার্জন ক্ষেত্রের এক সুবিপুল পরিবর্তন ও তারই ফলে ক্রমাগত রাজধানী-অভিমুখী bourgeois morale (অবশ্যই খণ্ডিত ও সংশয়দীর্ণ) স্বাক্ষর এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হয় যাদের বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে টোলের ভূমিকা কার্যকরী ক্ষেত্রে খুবই অপ্রয়োজনীয়

ছিল (Mcguire ১৯৮৩:৪২-৫৭)। টোলব্যবস্থাও এই দ্বিঘাত পরিবর্তন ও আগ্রাসনের সম্মুখে নিজেদের আদি অবস্থান পরিবর্তনে অসমর্থ হয় এবং বিংশ শতকে এসে ক্রমশই এক মুমূর্ষু ব্যবস্থায় পরিণত হয়। এই প্রবন্ধে টোল ব্যবস্থার সেই অবস্থান ও ভাঙন এবং তার সাথে জড়িত ঔপনিবেশিকতার উপহার আর্থিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও তারই পরোক্ষ ফল বুর্জোয়া শিক্ষা এবং জ্ঞানমার্গগুলির সম্পর্ক বিশ্লেষণের চেষ্টা হয়েছে।

ঔপনিবেশিক যুগে টোল ব্যবস্থার গৌরবময় ধারাঃ ঊনবিংশ শতকের আদি থেকে মধ্যভাগ

অষ্টাদশ শতকের অন্তর্ভাগ থেকে বাংলার চিরাচরিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে বিপুল ও ভাঙনমুখী পরিবর্তন দেখা যায় তার ফলেই টোল ব্যবস্থার মৌল পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রটি ভাঙনের সম্মুখীন হয়। ১৭৫৭-১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই বাংলায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজস্বনীতির ফলাফলে পেরাক ঔপনিবেশিক গ্রামীণ রাজন্যধারাগুলি (যারা টোলগুলির পৃষ্ঠপোষক ছিল) ভাঙনের সম্মুখীন হয়। বাংলার সংস্কৃত পরিবারের দুই প্রধান পৃষ্ঠপোষক অর্থাৎ কৃষ্ণনগর রাজ পরিবার এবং নাটোর জমিদারী অপরিশোধ্য ঋণজালে জড়িয়ে পড়ে। ১৭৮৪র পর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আশীর্বাদে বাংলায় যে absentee landlord শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে তাঁদের সংস্কৃতিচর্চা মূলতঃ ঔপনিবেশিক রাজধানীতেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শোভাবাজার রাজপরিবার সংস্কৃতচর্চায় বিশেষ আগ্রহী থাকলেও তাঁরা এই উদ্যম দেখিয়েছিলেন সংস্কৃত কলেজের পৃষ্ঠপোষণায়। গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের জীবনী থেকে পাই যে রাজা নবকৃষ্ণ রাজপুর গ্রামের বিখ্যাত বৈদিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্যামসুন্দর তর্কভূষণকে পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের (ত্রিবেণী) সঙ্গে তর্কযুদ্ধে বিজয়ী হওয়ায় রাজপুরে অনেক ভূসম্পত্তি দিলেও তাঁর টোল চালানোর কোন ব্যবস্থা করেন নি। যে শ্যামসুন্দরের একক পাণ্ডিত্যে রাজপুর ‘দক্ষিণ নবদ্বীপ’ নামে পরিচিত হয়েছিল তাঁর পৌত্র রামধন বিদ্যাবাচস্পতিকে গ্রামস্থ জমিদার দুর্গারাম করের অবস্থাবৈগুণ্য ঘটলে চতুষ্পাঠী বন্ধ করে দিতে হয় (বিদ্যারত্ন ১৯০৯ঃ২-৩)। অষ্টাদশ শতকের এই অবস্থারই সম্প্রসারণ ঘটে ঊনবিংশ শতকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলা যায় যে উনিশ শতকের আদি থেকে মধ্য পর্বে Macaulay Minute (১৮৩৫) বাংলায় দৃঢ়প্রোথিত হওয়ার আগে এবং Charles Wood’s Despatch (১৮৫৪) এর অবশ্যম্ভাবী ধারা অনুসারে ইংরাজী শিক্ষা infiltration গ্রাম বাংলাতেও সম্পূর্ণতা পাওয়ার আগে বাংলায় টোলশিক্ষার ধারা তার শেষ উজ্জ্বল অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতদের জীবনীপাঠে এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপীকামোহন ভট্টাচার্য্য এবং দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যদের রচনায় পণ্ডিতদের জীবনী এবং সংস্কৃত কলেজের ইতিহাসে উনিশ শতকে যে বহুসংখ্যক পণ্ডিতের নাম পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে অঙ্গুলীগণ্য কয়েকজনই কলকাতার বা বারানসীর সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন। বাকি সকলেই টোলধারারই অনুসরণকারী ছিলেন। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত ‘বঙ্গীয় সংস্কৃত অধ্যাপক জীবনী’তে আমরা ঊনবিংশ শতকের আদি ও মধ্য পর্বে আমরা এক বিপুল সংখ্যক অধ্যাপককে দেখতে পাই যাঁরা টোলের ছাত্র এবং অন্য বৃত্তি নেওয়ার সাথে সাথে বা অধিকতর বেতনের চাকুরী (যেমন কলেজের অধ্যাপক) হওয়ার আগে টোল বজায় রাখছেন। সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার ও পুরাবৃত্তের অধ্যাপক কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার (?-১৮৪৩) যার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত (ভট্টাচার্য্য ১৩৬৭ঃ৪৩)। তিনি প্রথমে স্বগৃহে টোল স্থাপন করে অধ্যাপনা, পরে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা এবং পরে মেদিনীপুরের জজপণ্ডিতের কাজে নিযুক্ত হয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন।

১৮৩৫ সালে সংস্কৃত কলেজের পাঠ শেষ করার পর এবং ১৮৩৮ সালে বারানসীতে পাঠ শেষ করার পর ১৮৪৫ সালে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণাধ্যাপকরূপে যোগ দেন। এর

মধ্যবর্তী সময়ে তারানাথ অন্যান্য বিভিন্ন ব্যবসার পাশাপাশি চতুষ্পাঠী করে ছাত্রদের বিদ্যাদান করেন। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন জানাচ্ছেন যে ১৮৪৪ সালের ১০ই ডিসেম্বর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কালনায় গিয়ে দেখেন যে তারানাথ নিজস্ব চতুষ্পাঠী স্থাপন করে বহু ছাত্রকে বিদ্যাদান করছিলেন। কিন্তু Major G.T. Marshall এর সংস্কৃত কলেজে তারানাথের জন্য কৃত সুপারিশ পত্রে দেখা যায় “ He does not teach a “Tole” or public school– but he has– I am creditebly informed several private pupils.....” (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৪৮ঃ১৫৪)। ন্যূনপক্ষ ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ অবধি প্রত্যক্ষভাবে এবং তারপরেও ব্যাকরণাধ্যাপক হিসাবে এবং একপত্রীরূপে পরোক্ষভাবে টোলের অধ্যাপনার সাথে যোগ ছিল। সংস্কৃত কলেজের ন্যায় অধ্যাপক নিমচাঁদ শিরোমণি পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ ঢাকা, মৈমনসিংহ, যশোর, বিক্রমপুর প্রভৃতি জেলার টোলের পণ্ডিতদের প্রেরিত নিমন্ত্রণপত্র গ্রহণের এবং তর্কযুদ্ধে যোগদানের অধিকারী বা ‘একপত্রী’ ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের প্রথম যুগে বাংলায় পণ্ডিতরা একশো টাকা পর্যন্ত সর্বোচ্চ বিদায় পেতেন (কিন্তু সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকরা নিয়মিত মাসিক বেতন পেতেন বলে পঁচিশটাকা পর্যন্ত বিদায় পেতেন। এই কারণে অপমানিত জ্ঞান করে কলেজের অধ্যাপক অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক নিমচাঁদ শিরোমণি নিয়ম করে যান যে যতদিন না পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকরা সর্বোচ্চহারে বিদায় পাবেন ততদিন তাঁরা বিদায় গ্রহণ করবেন না।) নিমচাঁদের পর একপত্রী হন ভবশঙ্কর তর্করত্ন এবং তারপর তারানাথ। তাঁর আমলেই সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকরা একশ টাকা হারে বিদায় পান এবং তারানাথ দীর্ঘতম সময় ‘একপত্রী’ থাকেন। এই একপত্রী থাকার ব্যাপারে শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন জানাচ্ছেন “ঐ পত্রের বিদায় আনা বড় কঠিন। সে দেশের জমিদার ও সম্ভ্রান্তগণ, পণ্ডিতদিগকে অত্যন্ত সম্মান করেন; কিন্তু বিচারে যদি পরাস্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিদায় পাওয়া দূরে থাকুক, তাঁহাদের পাথেয় পর্যন্ত দেন না। বরং তাঁহারা ইহাও বলিয়া থাকেন ‘কে তোমাকে টোল করিতে বলিয়াছিল?’.....তর্কবাচস্পতি মহাশয় ঐ সকল দেশে ক্রমান্বয়ে এক সভায় পঞ্চাশ বা ষাট জন পণ্ডিতের সহিত বিচার করিতেন.....এক এক সময় ষোড়শ বা সপ্তদশ দিবস বিচার হইত” (বিদ্যারত্ন ১৩০০ঃ৪৮-৪৯)। ১৮৫০ এবং ৬০এর দশকে ঐ বিরাট শাস্ত্রসভাগুলি টোলব্যবস্থার অস্তিত্বের উজ্জ্বল প্রমাণ। এ কথা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য যে তারানাথের পুত্র জীবানন্দ বিদ্যাসাগরও (১৮৪৪- ১৯০৬) সংস্কৃত কলেজ থেকে উপাধি লাভের পর লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজ এবং সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনার প্রস্তাব পান এবং পরে জব্বলপুর অঞ্চলের স্কুলসমূহের ইন্সপেক্টর হওয়ারও প্রস্তাব পান। কিন্তু উভয় প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করে নিজের গৃহে টোল স্থাপনা করে ছাত্রদের পাঠদান এবং সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা প্রকাশে ব্যাপৃত থাকেন (ভট্টাচার্য্য ১৩৬৭ঃ ১২৪)। তারানাথের টোলকেন্দ্রিক বিদ্যাভ্যাস ও বিদ্যাদানের ধারা পরবর্তী প্রজন্মেও বিস্তৃত ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-৯১) পূর্বপুরুষরা প্রত্যেকেই ‘সংস্কৃত ব্যবসায়ী’ ছিলেন। তারকেশ্বর ও আরামবাগের (তৎকালীন জাহানাবাদ) মধ্যবর্তী বনমালীপুর গ্রামনিবাসী বিদ্যাসাগরের বৃদ্ধ পিতামহ ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পিতামহ রামজয় তর্কসিদ্ধান্ত উভয়েই সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। রামজয় ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামের প্রখ্যাত পণ্ডিত উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের কনিষ্ঠা কন্যা দুর্গাদেবীকে বিবাহ করেন। বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাল্যকালে (উনিশ শতকের প্রথম দশকের শেষভাগ) মাতুলালয় বীরসিংহে মানুষ হতে থাকলে মাতামহ উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত ঠাকুরদাসকে কেনারাম বাচস্পতির টোলে শিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। কেনারাম ঠাকুরদাসকে বাংলা, শুভঙ্করী অঙ্ক ও সেরেস্তার কাগজ দেখা শিক্ষা হলে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ পড়াতে আরম্ভ করেন (বিদ্যারত্ন ১২৯৮ বঙ্গাব্দঃ ৩)। এই সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ পাঠের দীর্ঘ সময়কালই টোলে পড়ার ক্ষেত্রে এক বড় অন্তরায় হয়ে

উঠেছিল। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন জানাচ্ছেন যে বিদ্যাসাগরকে টোলে বা সংস্কৃত কলেজে কোথায় প্রবেশ করানো হবে এ বিষয়ে যখন দ্বন্দের সৃষ্টি হয়েছিল তখন ঠাকুরদাসের পরিচিত সংস্কৃত কলেজের তৃতীয় শ্রেণীর ব্যাকরণ অধ্যাপক গঙ্গাধর তর্কবাগীশ তাঁকে জানান “কলেজে প্রবেশ করিয়া দিলে ৫/৬ মাস পরে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, আপাততঃ মাসে মাসে ৫ টাকা বৃত্তি পাইবে, দেশের টোলে পড়িতে দিলে সংক্ষিপ্তসার অধ্যয়ন করিতে দীর্ঘ সময় লাগিবে। কলেজে মুক্তবোধ অধ্যয়ন করিয়া তিন বৎসরের মধ্যে ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি জন্মিলে কাব্যের শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে পারিবে” (বিদ্যারত্ন ১২৯৮ বঙ্গাব্দঃ ২১)। আমরা দেখতে পাই যে এই বৃত্তি এবং ব্যাকরণের ক্রমশঃ আধুনিকীকরণ (মুক্তবোধ থেকে সিদ্ধান্তকৌমুদী এবং সরলা) ছাত্রদের ক্রমশঃ টোল থেকে কলেজের দিকে আকৃষ্ট করছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও এই সময়েও টোলের গুরুত্ব কম ছিল না। বিদ্যাসাগরের জননী ভগবতী দেবী পাতুল গ্রামনিবাসী পঞ্চদশন বিদ্যাবাগীশের দৌহিত্রী ছিলেন। বিদ্যাবাগীশের সময় থেকে প্রতিষ্ঠিত আদি চতুষ্পাঠী ছাড়া ভগবতী দেবীর চার মাতুল রামামোহন বিদ্যাভূষণ, রামধন তর্কবাগীশ, গুরুপ্রসাদ শিরোমণি এবং বিশ্বেশ্বর তর্কালঙ্কারের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র চতুষ্পাঠী ছিল। ভগবতী দেবীর পিতা রামকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের নিজস্ব চতুষ্পাঠী ছিল গোঘাটে। একটিমাত্র পরিবারের সাথে যুক্ত মোট ছয়টি চতুষ্পাঠী, টোলের বৃহৎ ছাত্রসম্পদের কথা ঘোষণা করে। বিদ্যাসাগরের চাকুরীজীবনে টোল, নর্ম্যাল স্কুল এবং সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের যোগ এবং তাদের নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যবস্থা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে। সংস্কৃত কলেজে টোলের পণ্ডিতদের পরিবর্তে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের নিয়োগের ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা সর্ববাদীসম্মত। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের জ্যোতিষ ও গণিত বিভাগের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক যোগদ্যান মিশ্রের মৃত্যু হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ টোলের অধ্যাপকদের মধ্য থেকে উপযুক্ত জ্যোতিষ-গণিত বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক নির্বাচনের সিদ্ধান্ত করলে বিদ্যাসাগর তার পরিবর্তে সংস্কৃত কলেজের জ্যোতিষ ও গণিত বিভাগের শ্রেষ্ঠ ছাত্র প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য সিদ্ধান্তপঞ্চদশনকে নিয়োগের অভিমত প্রকাশ করেন এবং প্রিয়নাথ উক্ত পদে নিযুক্ত হন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রিয়নাথ দেওয়ানি আইন পাস করে ওকালতি শুরু করলে সংস্কৃত কলেজে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে গণিত শিক্ষা দেওয়া শুরু হয় (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৩৯ঃ ২৪৮)। কিন্তু এ সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর টোলের ছাত্রদের একাদিক ক্ষেত্রে নর্ম্যাল স্কুলে এমনকি সংস্কৃত কলেজে নিয়োগ করেছেন ও তা নিয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে বিবাদও করেছেন যার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল মহেশ ন্যায়রত্নের নিয়োগ। ১৮৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কারের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ অবসর গ্রহণ করলে প্রেমচাঁদেরই কনিষ্ঠ সংস্কৃত কলেজের অতি উজ্জ্বল ছাত্র রামময় ভট্টাচার্য্য যিনি কাব্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, স্মৃতি ও দর্শন পাঠ করে কলেজের সর্বোচ্চ বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন তিনিই এই পদের জন্য প্রার্থী হন। রামময় কাব্য, অলঙ্কারের জ্ঞানের এবং সংস্কৃত শ্লোক রচনার ক্ষমতার জন্য বিশেষ পরিচিত ছিলেন। একই সময় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নও এই একই পদের প্রার্থী হন যাঁর ন্যায়শাস্ত্র জ্ঞান তখন বহুল পরিচিত ছিল। প্রেমচাঁদ ও অন্যান্য ব্যক্তির রামময়ের এই পদপ্রাপ্তি বিষয়ে নিঃসংশয় ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন প্রিন্সিপাল Edward Byles Cowell এই পদপ্রাপ্তির উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচনের জন্য বিদ্যাসাগরের শরণাপন্ন হলে বিদ্যাসাগর জানান যে অলঙ্কারের শ্রেণীতে কাব্য-প্রকাশ পড়াতে হলে ন্যায় ভালো জানা প্রয়োজন তাই মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নই এই পদের যোগ্য (বিদ্যারত্ন ১২৯৮ বঙ্গাব্দঃ ১৭৩-৭৪)। এই বিশেষ ঘটনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৮৬৪ সালেও সংস্কৃত কলেজের ছাত্র অপেক্ষা টোলের ছাত্রকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের প্রতি একদেশদর্শীতার অভিযোগের এটিকে প্রতিবাদ বলা যায়।

মফঃস্বলের টোল থেকে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ নর্ম্যাল স্কুলের পণ্ডিত পদপ্রার্থী হতেন তাদের গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষাদানের বিশেষ ব্যবস্থা করেন। টোলের পণ্ডিতদের নিয়োগের ক্ষেত্রে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হল নৈহাটীবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত নন্দকুমার ভট্টাচার্য ন্যায়চুধুর নিয়োগ। নন্দকুমারের ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা খ্যাতি সেই সময় বহুবিস্তৃত ছিল এবং বিদ্যাসাগর তাঁকে সংস্কৃত কলেজে উচ্চ পদ দিতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন না বলে শিক্ষাবিভাগের তদানীন্তন ডাইরেক্টর Gordon Young এই প্রস্তাব সমর্থন না করলে তিনি কিছুদিন নন্দকুমারকে ঐ পদে নিযুক্ত করেন। পরে জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের সাথে নন্দকুমারের বিখ্যাত শাস্ত্রালোচনার পর পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্রের সাহায্যে তাঁদের মর্শিদাবাদের কান্দীতে প্রতিষ্ঠিত স্কুলে নন্দকুমারকে প্রধান পণ্ডিত করে পাঠান। নন্দকুমারের আকস্মিক জ্বররোগে মৃত্যু হলে কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁর সহোদরদের অর্থাৎ যদুনাথ ভট্টাচার্য এবং হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য (পরে শাস্ত্রী) কে টোল থেকে ছাড়িয়ে এনে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশের ব্যবস্থা করেন (বিদ্যারত্ন ১২৯৮ বঙ্গাব্দঃ ১০৯-১০)। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ভাটপাড়ার বিখ্যাত নৈয়ায়িক রাখালদাস ন্যায়রত্ন গৃহে টোল করে কিছু ছাত্রকে ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়ার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু তাঁর পিতা ছাত্রদের ব্যয়বহনে অস্বীকৃত হলে তিনি তাঁর শিষ্য মাখনলাল ভট্টাচার্যের দ্বারা বিদ্যাসাগরের কাছে আবেদন করলে বিদ্যাসাগর তাঁর পসার না হওয়া পর্যন্ত মাসিক দশ টাকা সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হন এবং আট বছর যাবৎ এই সাহায্য করেন (বিদ্যারত্ন ১২৯৮ বঙ্গাব্দঃ ১৬১-৬২)। বিধবাবিবাহ প্রবর্তন ও বহুবিবাহ নিবর্তন এর ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের সাথে বিতর্করত পণ্ডিতগণ যেমন ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, ভুবনমোহন ন্যায়রত্ন, ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, জনমেজয় কবিরত্ন, রাজকুমার ন্যায়রত্ন প্রভৃতি প্রত্যেকেই টোলের ছাত্র ছিলেন। স্মার্ত ব্যবস্থাপকরূপে তাঁদের প্রতিষ্ঠা এবং শোভাবাজার রাজবাড়ী, যশোর হিন্দু ধর্মরক্ষিণী সভা প্রভৃতি স্থানে তাঁদের বিপুল প্রতিপত্তি ও উপাধি লাভ (যেমন ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের ‘নবদ্বীপচন্দ্র’ উপাধি লাভ) টোলের পণ্ডিতদের গুরুত্বের কথা ঘোষণা করে। উনিশ শতকের আদি-মধ্য ভাগে টোলগৃহে যাঁর বিদ্যাচর্চার শ্রেষ্ঠ বিবরণ পাওয়া যায় তিনি হলেন পুর্বোল্লিখিত পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের (যিনি সংস্কৃত কলেজের ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপকও) নারিকেলডাঙ্গার টোলে তাঁর অধ্যয়ন প্রসঙ্গে হরিশচন্দ্র কবিরত্ন জানাচ্ছেন “একটি দোতারা কোটা ও দুটি লম্বা খোড়ো ঘর ছিল.....খোড়ো ঘরের একখানিতে ছাত্রগণ বাস করিতেন। আমাদের আমলে দেখিয়াছি, মহেশ ন্যায়রত্ন, হরচন্দ্র, গৌরীশঙ্কর ঘোষাল ও আরও একজন ছাত্র, তাঁহার নাম আমার মনে নাই, তাঁহার টোলে পাঠ করিতেন-আমরা যখন ভাষা- পরিচ্ছেদ পাঠ করি, তখন মহেশ ন্যায়রত্ন আমাদের সঙ্গে কলেজে আসিয়া পড়িতেন। কারণ ভট্টাচার্য মহাশয় বলিয়াছিলেন ‘দুই বার করিয়া ভাষা পরিচ্ছেদ পড়ানর দরকার নাই; একসঙ্গে পড়া হইলে আমার পরিশ্রম লাঘব হয়’ সংস্কৃত কলেজে যে সকল ন্যায়ের পুস্তক পড়া হইত; তাঁহার টোলে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী হইত। তাঁহার বিরচিত সর্বদর্শন-সংগ্রহ গ্রন্থে, তিনি মহেশ ন্যায়রত্নকে যে সকল গ্রন্থ পড়াইয়াছিলেন তাহার একটি তালিকা দিয়াছেন। তাহা দেখিয়া আমরা অবাক হইয়াছিলাম যে ন্যায়রত্ন এত দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন”। (কবিরত্ন ১৩৩২ঃ ৬৫১)। দেখা যাচ্ছে যে সংস্কৃত কলেজের নির্দিষ্ট সময়ে ন্যায় পাঠের চেয়ে টোলের বিশেষীকৃত পাঠে কোন নির্দিষ্ট শৃঙ্খলার বিকাশ বেশী হত ও তা কলেজের ছাত্রদের আকর্ষণের বিষয় ছিল। জয়নারায়ণ ঔপনিবেশিক জ্ঞানচর্চার পদ্ধতিটির সাথে প্রাক ঔপনিবেশিক ধারার এক সুষ্ঠু শৃঙ্খলা ঘটান। তাঁর পেশাগত ক্ষেত্রে ‘কালেজী’ এবং তাঁর ব্যক্তিক ক্ষেত্রে ‘টোল’ ধারা বজায় ছিল। গোপীকামোহন ভট্টাচার্য জানাচ্ছেন যে নবদ্বীপের বিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীনন্দন তর্কবাগীশ এবং আমাদের পূর্বোল্লিখিত ভাটপাড়ার প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রাখালদাস ন্যায়রত্ন (পরে

মহামহোপাধ্যায়) এই টোলেরই ছাত্র ছিলেন। মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন (১৮৩৬-১৯০৫) এই টোলে যা অধ্যয়ন করেন তার তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে তিনি ‘বৈশেষিক দর্শন, তদভাষ্য, কিরণাবলী, ভাষা পরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, বৈশেষিক সূত্রোপস্কার, ন্যায়সূত্র, তদবৃত্তি, কপিলসূত্র, তদভাষ্য, সাংখ্যকারিকা, তত্ত্বকৌমুদী, পাতঞ্জলসূত্র, তদবৃত্তি, তদ্বিত্তি, বেদান্তভাষ্য, শঙ্করাচার্যকৃত তদভাষ্য, পঞ্চদর্শী, বেদান্তসার, বেদান্তপরিভাষা, চিন্তামণি-দীপীতি, মাধুরী, জাগদীশী, গাদাধরী, শব্দখণ্ডের আলোক, তন্মাথুরী, শব্দশক্তিপ্রবেশিকা, ব্যুৎপত্তিবাদ, নঞবাদ, শক্তিবাদ, ভ্রুবাদ, আখ্যাতবাদ, মুক্তিবাদ, মুক্তিবিচার প্রভৃতি নব্য ও প্রাচীন গ্রন্থ আদ্যন্ত সমুদায় অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং শ্রীহর্ষকৃত খণ্ডনগ্রন্থ এবং শিরোমণিকৃত খণ্ডনগ্রন্থ উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন, অলঙ্কার শাস্ত্রের কাব্যপ্রকাশ ও সাহিত্য দর্পণ এবং স্মৃতিশাস্ত্রের নব্যতত্ত্ব সমুদায় এবং প্রাচীন মিতাক্ষরা, শ্রাদ্ধবিবেক, প্রায়শ্চিত্তবিবেক, দায়ভাগ, বিবাদচিন্তামণি, দত্তকচন্দ্রিকা, দত্তকমীমাংসা প্রভৃতি গ্রন্থ সকলের তদাদিদন্ত সমুদয় পাঠ করিয়াছেন” (ভট্টাচার্য্য ১৯৬১ঃ৩৭)। মহেশচন্দ্র এই সকল দর্শনগ্রন্থ সবই জয়নারায়ণের টোলে এবং স্মৃতি, অলঙ্কার, ব্যাকরণ ইত্যাদি কিছু সংস্কৃত কলেজে ও কিছু প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের গৃহে এবং কিছু বারানসীতে অধ্যয়ন করেন। জয়নারায়ণ ও তাঁর প্রিয়তম ছাত্র মহেশচন্দ্রের শিক্ষাজীবন টোল ঘরানার শিক্ষাব্যবস্থার এক উজ্জ্বল চিত্র। এই টোলে অভিজ্ঞতার উজ্জ্বল চিত্র মহেশচন্দ্রকে পরবর্তী কালের টোলের দৈন্যদশা ঘোচাতে এবং প্রাচীনপন্থী টোলগুলিকে সংস্কারের ক্ষেত্রে নিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করে।

উনবিংশ শতকের প্রথম থেকে মধ্যভাগে ইংরাজী শিক্ষার সম্প্রসারণের পাশাপাশি টোল ব্যবস্থার এই উজ্জ্বল চিত্র নিশ্চয়ই টোল ও সংস্কৃত শিক্ষার এক সম্প্রসারণেরই ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু একথাও এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে Charles Wood এর theory of infiltration তখনো পূর্ণমাত্রায় প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি এবং গ্রাম ও মফঃস্বল অঞ্চলে ইংরাজী প্রাইমারী স্কুল, নর্ম্যাল স্কুল, বেঙ্গলী স্কুল এবং অ্যাংলো-ভার্নাকুলার স্কুলগুলি বিস্তার লাভ করে নি। ইংরাজী ও পাশ্চাত্য বিদ্যা শেখার প্রায় যাবতীয় কেন্দ্রগুলি নগর কলকাতায় অবস্থিত হওয়ায় গ্রাম ও মফঃস্বলের সাথে যে দূরত্বের সুযোগ তাই টোল ও পাঠশালাগুলিকে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছিল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগরের কলকাতা পড়তে যাওয়া উপলক্ষ্যে শম্ভুচন্দ্র জানাচ্ছেন “অগ্রজকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার নাম শুনিয়া জননীদেবী উচ্চৈশ্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে এ প্রদেশের কাহারও লেখাপড়া শিখিবার জন্য কলিকাতায় যাইবার রীতি ছিল না। ব্রাহ্মণতনয়গণ কেহ কেহ বাল্যকালে টোলে পড়িত। অধিক বয়স হইলে বিদেশের টোলে অধ্যয়নার্থ যাত্রা করিত। কেহ কেহ জমিদারি সেরেস্তায় কাগজ লিখিতে শিখিত” (বিদ্যারত্ন ১২৯৮ঃ১৬)। কালিদাস সার্বভৌম ‘অত্যন্ত হিন্দু’ রামকমল সেন তাঁর পুত্রের খ্রীষ্টান না হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বহু প্রকার প্রতিশ্রুতি দিলে তবেই কিশোর তারানাথকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেন (বিদ্যারত্ন ১৩০০ঃ৭)। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা স্কুল, ভার্নাকুলার স্কুল, এবং অ্যাংলো-সংস্কৃত স্কুলগুলি এই প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কলকাতায় যাওয়ার প্রয়োজনকে কমিয়ে আনে এবং রেলব্যবস্থার ক্রমবিস্তারশীল প্রচলন কলকাতার অবস্থানকেও অনেক কাছে এনে দেয়। এই দ্বৈত পরিবর্তন কিভাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে টোল ব্যবস্থার মূলটিকে দুর্বল করে তা আমরা পরবর্তী অংশে আলোচনা করেছি। স্কুল এবং প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের এই কার্যে প্রধান ভূমিকা নেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো কিছু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতরাই।

টোলব্যবস্থার ভাঙন ও অবক্ষয়ঃ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিংশ শতকের তৃতীয় দশক

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে টোলকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার ভাঙনের প্রসঙ্গে আলোচনায় প্রথমেই যে কথাটি স্মর্তব্য তা হল যে এটি একটি সম্পূর্ণ জ্ঞানবাদী পাঠ্যক্রম ছিল। কার্য্যকারক ও উপার্জনের ক্ষেত্রে সহায়ক পাঠ্যক্রম এটি বিশেষ ছিল না। আদি আধুনিক যুগ ও উপনিবেশিক যুগের প্রথম দিকেও গ্রামের ছাত্ররা পাঠশালাে বাংলা পড়াশোনা, চিঠিপত্র লেখা, সরল শুভঙ্করী, জমিদারি ও মহাজনী হিসাব রাখা প্রভৃতি শিখত যা তাদের মুহুরী, পাটোয়ারী, গোমস্তাগিরি, মহাজনী হিসেব রাখা ও কানুনগো প্রভৃতি কাজের উপযুক্ত করে তুলত। উচ্চাভিলাষী যারা রাজসরকারে কাজ চাইত তারা পাঠশালার পড়াশোনা সাজ করে মন্তবে প্রবেশ করে ফার্সী লেখাপড়া, হিসাব, আইন ও কিছু দর্শন শিখত (আচার্য্য ২০০৯ঃ ২০৯-১৫)। টোলী শিক্ষাব্যবস্থা যে অল্প কিছু আর্থিক উপার্জনের পথ রেখেছিল তার অন্যতম ছিল বৈদ্যকশাস্ত্র পাঠ। বৈদ্যশাস্ত্র বা কবিরাজী শিক্ষার পর ছাত্ররা ভিষকশাস্ত্রী ও ভিষকরত্ন উপাধি পেত ও স্বাধীনভাবে চিকিতসক বৃত্তি নিত। এছাড়া যে পেশাগুলি ছিল তা হল বিভিন্ন শাস্ত্রালোচনায় ও তর্কে অংশ নেওয়া এবং এই ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন ব্রাহ্মণভোজনে নিমন্ত্রণ এবং বিদায় প্রণামী পাওয়া। বিদ্যা, সদাচার ও কৌলীন্যক্রমে এই বিদায় দেওয়া হত। বিদায়ে থাকত কিছু নগদ টাকা, পিতলের ঘড়া, পিতলের কিছু বাসন, উড়ানি ও চাদর ইত্যাদি। জমিদার বা বিদায় কর্তা ধনী হলে গোবৎস, স্বর্ণখণ্ড ও অধিক পরিমাণ নগদ অর্থ পাওয়া যেত। শঙ্কুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখিত তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবনী থেকে জানা যায় যে সংস্কৃত কলেজের প্রথম যুগে বাংলায় পণ্ডিতরা একশো টাকা পর্যন্ত সর্বোচ্চ বিদায় পেতেন কিন্তু সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকরা নিয়মিত মাসিক বেতন পেতেন বলে পঁচিশটাকা পর্যন্ত বিদায় পেতেন। এই কারণে অপমানিত জ্ঞান করে কলেজের অধ্যাপক নৈয়ায়িক নিমাইচাঁদ শিরোমণি নিয়ম করে যান যে যতদিন না পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকরা সর্বোচ্চহারে বিদায় পাবেন ততদিন তাঁরা বিদায় গ্রহণ করবেন না (বিদ্যারত্ন ১৩০০ বঙ্গাব্দঃ ২৫)। এছাড়াও বিদায়ে থাকত বিভিন্ন ভোজ্যপূর্ণ সিধা বা মধুপুরী। হরিশচন্দ্র কবিরত্ন লিখিত তাঁর পিতা পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের জীবনী থেকে জানা যায় যে উনিশ শতকের সাতের দশকে ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের যে ঘড়াগুলি বিদায় দেওয়া হত তা অধিকাংশ সময়েই পুরানো ও সছিদ্র হত তাই গিরিশচন্দ্র তাঁর মাতৃশ্রদ্ধে বিশেষ বায়না দিয়ে উত্তম ঘড়া আনিয়েছিলেন (কবিরত্ন ১৯০৯ঃ ৫৯)। বিদায়ের নগদ অর্থ মূলত ‘বিদায়’, ‘প্রণামী’ ও ‘পাথেয়’ বলে পরিচিত ছিল। ‘বিদায়-আদায়’ ব্যতীত আরেকটি উপার্জনের রাস্তা ছিল নিজে টোল করে বিদ্যাদান করা। টোলের ব্যয়ভার যেহেতু প্রায়ই স্থানীয় জমিদার বা ধনীর অনুগ্রহের (মূলতঃ মাসিক বৃত্তি ও সিধা) উপর নির্ভর করত তার ফলে প্রায়ই টোলের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য একটা অনিশ্চিত স্থানে থাকত। উপনিবেশিক যুগে শিক্ষানীতির ব্যবস্থার ফলে জমিদাররা বাংলা স্কুল ও নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হলে (যতই সীমাবদ্ধভাবে হোক) টোলের পৃষ্ঠপোষকতার ধারা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে পড়ে। স্মার্ত পণ্ডিতদের আরেকটি পেশা ছিল বিভিন্ন ধর্মীয় এবং ক্রিয়াকাণ্ডে ব্যবস্থা দেওয়া। বিদ্যাসাগর রচিত বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রস্তাবগুলি থেকে এবং ‘উপযুক্ত ভাইপোস্য’ ছদ্মনামে লিখিত ব্যঙ্গাত্মক রচনাগুলি থেকে জানা যায় যে স্মার্তেরা এই আর্থিক প্রয়োজনে কতপ্রকার অসৎ ও অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিতেন (বিদ্যাসাগর ১২৯১ বঙ্গাব্দঃ ৫-৫৪)। এছাড়া টোলের ছাত্রদের আরেকটি পেশা ছিল পুঁথি নকল করা যদিও তা মোটেই বিশেষ অর্থকরী ছিল না। মূলতঃ ছাত্রাব্যস্তাতেই এই পেশা নেওয়া হত উপাধিপ্রাপ্তির আগে। গ্রন্থের টীকা রচনা ও ভাষ্যপ্রণয়ন সম্বন্ধেও একই কথা। এই আর্থিকমার্গগুলি কোনটিই খুব সুগম ছিল না ও উপনিবেশিক নয়া অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে তা

ক্রমেই অধিক দুর্গম ও সীমাবদ্ধ হয়ে ওঠে। বিদ্যাসাগরের স্বরচিত অসমাপ্ত আত্মচরিত থেকে জানা যায় যে উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই (১৯৩০-৩১ নাগাদ) ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে কোথায় ভর্তি করবেন তা নিয়ে সংশয়ে পড়েছিলেন। যদি তিনি তাকে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করাতেন তাহলে তাঁর অভিপ্রেত সংস্কৃত শিক্ষা হত না অন্যদিকে যদি তিনি ঈশ্বরকে চতুষ্পাঠীতে পাঠ নিতে দিতেন তাহলে চাকুরী করে কোন আর্থিক সাচ্ছন্দ্য আনার সম্ভাবনাকে জলাঞ্জলি দিতে হত। এমতাবস্থায় বিদ্যাসাগরের মাতুলপুত্র সংস্কৃত কলেজের ছাত্র মধুসূদন তর্কবাচস্পতি ঠাকুরদাসকে সম্মত করান বিদ্যাসাগরকে সংস্কৃত কলেজে পড়তে দিতে। তিনি ঠাকুরদাসকে বোঝান যে চতুষ্পাঠী অপেক্ষা কলেজে অনেক ভালো সংস্কৃত শিক্ষা হয় এবং অন্যদিকে চাকুরী পাওয়ারও সুবিধা আছে। সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা স্মৃতি ভালোভাবে পাস করলে তাদের জজপণ্ডিত পদে নিযুক্ত করা হয় (বিদ্যারত্ন ১২৯৮ বঙ্গাব্দঃ ২১-২২)। বলাবাহুল্য এই জজপণ্ডিত পদের সুযোগ সব টোলার ছাত্ররা পেত না। তারানাথ তর্কবাচস্পতির পিতামহের ভ্রাতা দুর্গাচরণ শিরোমণি, পিতা কালিদাস সার্বভৌম এবং জ্যেষ্ঠতাতের পুত্র তারিণীচরণ বেশ কিছুদিন জজপণ্ডিত ছিলেন (বিদ্যারত্ন ১৩০০ বঙ্গাব্দঃ ৪-৬)। কিন্তু এ সকল সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার আগের কথা। কলেজ প্রতিষ্ঠার পর ও সেখান থেকে উজ্জ্বল ছাত্ররা বার হলে (যেমন মদনমোহন তর্কালঙ্কার জজপণ্ডিত হন) পদটি প্রায় তাদেরই একচেটিয়া হয়ে পড়ে। ১৮৬০এর দশকে সংস্কৃত কলেজের বিখ্যাত স্মৃতি অধ্যাপক ভরতচন্দ্র শিরোমণির সহায়তায় ব্রাহ্মসমাজের বিখ্যাত পণ্ডিত শ্যামাচরণ সরকার শর্মা ‘ব্যবস্থা-দর্পণ’ প্রকাশ করলে এবং তা হিন্দু সিভিল আইনের প্রামাণ্য ব্যাখ্যারূপে আইনব্যবস্থায় গৃহীত হলে জজপণ্ডিতের পদই অর্থহীন হয়ে যায় ও ক্রমে জজপণ্ডিত ও জজমৌলভী দুটি পদই উঠে যায় (কবিরত্ন ১৩৩২ বঙ্গাব্দঃ ৮৯১)। সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা যাতে ডেপুটির পদ পায় এই দাবীতে বিদ্যাসাগরকে প্রায় কর্তৃপক্ষের সাথে যুদ্ধ করতে হয়েছিল (বিদ্যারত্নঃ ১২৯৮ বঙ্গাব্দঃ ১৪৮-৪৯)। এই পরিস্থিতিতে টোলার ছাত্রদের অবস্থা কি করণ ছিল তা সহজেই অনুমেয়। ১৮৫২ সালের ১২ এপ্রিল বিদ্যাসাগর তাঁর কলেজের রিপোর্টে টোলার পণ্ডিতের বদলে সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের সংস্কৃত সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনার প্রস্তাব করলে ও তা গৃহীত হলে টোলার পণ্ডিতদের সংস্কৃত কলেজে ঢোকাও প্রায় বন্ধ হয়ে যায় (বিদ্যাসাগর ১৪১৩ বঙ্গাব্দঃ ১৩-১৮)। মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন বা চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের মতো কয়েকজন অতি প্রতিভাবান পণ্ডিত যদিও অধ্যাপনাপদে গৃহীত ও মহেশচন্দ্র প্রিন্সিপাল পর্যন্ত হলেও এগুলি অঙ্গুলীগণ্য ব্যতিক্রম মাত্র। এশিয়াটিক সোসাইটি বা সংস্কৃত কলেজের পুঁথি সটীক মুদ্রণের কাজে যাঁরা যুক্ত হতে পেরেছিলেন তাঁরা সাময়িক মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থান পেয়েছিলেন কিন্তু তাও কোন স্থায়ী সমাধান ছিল না। এছাড়া অবশ্যই পৌরোহিত্যের পেশা গ্রহণের প্রসঙ্গটি ছিল। কিন্তু পুরোহিতের কাজ প্রায়ই বংশ বা কুলপরম্পরা ক্রমে ছিল এবং টোল-চতুষ্পাঠীর উপাধিধারী পণ্ডিতরা যে যাজনকর্মকে অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখতেন তার প্রমাণ টোল ও সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতদের জীবনীতে পাওয়া যায়।

উনিশ শতকের শেষ দিকে এই সমস্যা অধিকতর কঠিন হয়ে ওঠে। বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রীর স্মৃতিকথা থেকে আমরা জানতে পারি যে উনিশ শতকের শেষ দিকে সংস্কৃত পড়ার সিদ্ধান্ত নিলে তাঁর পরিবারের লোকজন তিনি কোনদিনও উপার্জনক্ষম হবেন এই আশা ত্যাগ করেন (শাস্ত্রী ২০১১ঃ ৪০)। প্রথম মহাযুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে এই ভাঙন প্রায় সর্বাঙ্গিক রূপ নেয়। এই সময় গ্রাম অর্থনীতিতেও নগদ অর্থ প্রায় সর্বাঙ্গিক বিস্তার পায় এবং সিধে ও বিনিময় নির্ভর টোলব্যবস্থা প্রায় চূর্ণ হয়ে যায়। একে ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক পরিভাষায় ‘নগদ পয়সার ধাক্কা’ বলা যায়।

মেকলের প্রশয়প্রাপ্ত কোলকাতার ইংরাজী শিক্ষিত ভদ্রলোক যুবসমাজ সংস্কৃতকে দেখতেন উন্মাসিক দৃষ্টিতে। হিন্দু বা প্রেসিডেন্সী কলেজে সংস্কৃত আদৌ পড়ান হত না যেমন হত না অন্য অনেক কলেজেই। কলিকাতা ইউনিভার্সিটিতে সংস্কৃত ছিল ঐচ্ছিক বিষয়। চার্লস উড ডেসপ্যাচ থেকে স্যাডলার কমিশন পর্যন্ত বিভিন্ন শিক্ষানীতিতেই পর্যায়ক্রমেই টোল ও সংস্কৃতচর্চা অবহেলিত হয়ে চলেছিল। বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে ‘বাংলা স্কুল’ ও ‘নর্মাল স্কুল’ গুলি টোলের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দীনেন্দ্রকুমার রায়ের ‘সেকালের স্মৃতি’ থেকে আমরা জানতে পারি কিভাবে কুস্তিয়ায় তাঁর গ্রামে টোল-পাঠশালার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল বাংলা স্কুল এবং শেষ পর্যন্ত স্থানু, প্রাচীনপন্থী টোলের পরাজয় নিশ্চিত হয় (রায় ১৩৫৩ বঙ্গাব্দঃ ২৬-২৭)। অনেক চতুঃপাশীর পণ্ডিত এই বাংলা স্কুলের পণ্ডিত হতে বাধ্য হন (বিদ্যারত্ন ১২৯৮ বঙ্গাব্দঃ ৯৯-১০০)। এমনই এক হতমর্যাদা অথচ আত্মসম্মানপূর্ণ পণ্ডিতের বর্ণনা আমরা পাই অনেক পরে রচিত সৈয়দ মুজতবা আলীর অতুলনীয় গল্প ‘পাদটীকা’য় (আলী ১৩৬৫ বঙ্গাব্দঃ ১৩৮)। আমাদের মনে পড়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘অনুবর্তন’ উপন্যাসেও সেই নিত্য সাহেবের কাছে অপমানিত, দরিদ্র স্কুলমাস্টার যদুবাবুর নিজের সঙ্গে পণ্ডিত জগদীশ জ্যোতির্বিদ্যার তুলনা করে বেতনবিষয়ক সেই গর্বোক্তি ‘আন্ডার- গ্র্যাজুয়েট ও পণ্ডিত এক স্কেলে মাহিনা পাইবে তাহা কখনো হইতে পারে না’ (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ঃ ৮৩১)। ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থায় টুলো পণ্ডিতের মান কোথায় নেমেছিল এ তারই করুণ উদাহরণ। পথের পাঁচালীর হরিহর রায়ের কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যাঁর মত ‘বিদ্যা শিখিয়া এ অঞ্চলে কেহ আসে নাই’ (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১০ঃ ১০১)। কিন্তু যুগবৈপ্লব্যে তাঁকে সভাপণ্ডিতের পদ দিতে কোন সিপাহী আসে না বরং তাঁর দারিদ্র্য নিদারুণতর হয়ে ওঠে। পেশাগত ক্ষেত্রে নেমে সংস্কৃতজ্ঞান অভিমানী হরিহর ‘দেবনাগরী বর্ণজ্ঞানহীন বাঙাল’ কথকঠাকুরের বৈষয়িক বুদ্ধির কাছে নতমস্তক হতে বাধ্য হয় (বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ ২০১০ঃ ১৩৭)।

অপরদিকে গোঁড়া সংস্কৃতজ্ঞ ভট্টাচার্য্যরা যুগের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজেদের জ্ঞানভাণ্ডার সঙ্গোপনে রক্ষা করেন। তাঁরা যে শুধু টোলে কোন নতুন পাঠ্যক্রম চালু করতে অনাগ্রহী ছিলেন তাই নয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের লেখা থেকে জানতে পারি সমসাময়িক Anglo-Sanskrit School-গুলির পরিবর্তিত সংস্কৃত পাঠ্যক্রম (যা নির্ধারণ করেছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকেরাই) একবার দেখতেও অস্বীকার করেন (বিদ্যাভূষণ ১৮৭২ঃ ২৫)। যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকরা মূলতঃ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও পরে জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ও চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার অজস্র সংস্কৃত গ্রন্থ সটীক সম্পাদন ও মুদ্রণ করছিলেন এবং প্রায় একই সময় একই কাজ এশিয়াটিক সোসাইটিতে চলছিল রাজেন্দ্রলাল মিত্রের তত্ত্বাবধানে টোলের পণ্ডিতরা সেই সময়েও সেই হস্তলিখিত পুঁথি ও স্মৃতিশক্তি নির্ভর ব্যবস্থাকেই চালিয়ে নিয়ে যেতে দৃঢ়কল্প ছিলেন। তারানাথ তর্কবাচস্পতি যখন কাশী থেকে মূল সিদ্ধান্তকৌমুদী আনিতে তার সটীক সংস্করণ মুদ্রিত করেন ও সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ চর্চাকে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক রূপ দিতে চান তখনো টোলের পণ্ডিতরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখে তাঁদের সাবেক মুঞ্চবোধ, ভট্টিকাব্য ও অমরকোষের ধারাই বজায় রাখতে চান। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই গোঁড়া ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের সম্পর্কে তাঁর ‘The Intellectual Superiority of Europe’ নামক পত্রপ্রবন্ধে লেখেন

“All who have studied under the older generations of Bhattacharyas of the tols, know, as I have the good fortune to know, that of the wealth of learning which flowed from their lips, much had no record except the memory of the professors. This was specially the case

with artistic and simplistic knowledge, where another motive-professional jealousy-came into play. Each discoverer, anxious to confide to himself and his own circle the discovery at which he had arrived, never trusted it to writing and satisfied himself with communicating it to his pupils in confidence. To this jealousy we owe that India has now utterly lost so many of her ancient arts and so much of her ancient sciences” (উদ্ধৃত চক্রবর্তী ১৯৯৫: ১০৩)।

উনিশ শতকের শেষপাদ অবধিও টোলের এই ধারা প্রায় অব্যাহত ছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে টোল এবং টোলধারীদের বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচার পদ্ধতি একমাত্র উপেক্ষার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। Brian A. Hatcher তাঁর প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে এই সময় পণ্ডিতরা তাঁদের পার্থিব জ্ঞান ও ব্যাখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে গণমানসে ও বিদ্যাজগতে ক্রমশই হেয় হয়ে পড়ছিলেন। বিদ্যাসাগর থেকে বনমালীচন্দ্র বেদান্ততীর্থ পর্যন্ত সংস্কৃতজ্ঞরাই পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা রীতি ও গোঁড়ামি নিয়ে কঠিন ভাবে সরব হচ্ছিলেন। নূতন সৃষ্ট bourgeois morale-র সামনে প্রাচীন এই ব্রহ্মণ্যপাণ্ডিত্য নিতান্তই হীন প্রতিপন্ন হচ্ছিল (Hatcher 2005-696-97)। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় “সংস্কৃতওয়ালাদের” লিখনশৈলী নিয়ে ক্রমশই হয়ে উঠছিলেন ব্যঙ্গাত্মক এবং অক্ষয়কুমার সরকার প্রমুখ তাঁর অনুগামীরা দ্বরকানাথ বিদ্যাবূষণ সম্পাদিত এবং সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের রচনাবহুল সোমপ্রকাশ সংবাদপত্রে ‘ভট্টাচার্য্যের চানা’ নাম দিয়ে বিদ্রূপ করতে থাকেন (শাস্ত্রী ১৯০৪: ২৭১)। বঙ্কিমচন্দ্র হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে জানান সাহিত্য সমালোচনার শ্রেষ্ঠ ও উচিত রূপ হল জার্মান শৈলী। (শাস্ত্রী ১৯৯৫: ১২) সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররাই টোলের শিক্ষার সীমাবদ্ধতা এবং স্থূলতা বিষয়ে বিরূপ মন্তব্য করেন। সংস্কৃত কলেজে প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের ধারায় অনুপ্রাণিত এবং মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের অসমান্য ও বহুমুখী অলঙ্কার শ্রেণীর পাঠের ছাত্র হরপ্রসাদ শাস্ত্রী টোলের পণ্ডিতদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে মন্তব্য করেন “আমি তাঁহার (ভাটপাড়ার পণ্ডিত শ্রীরাম শিরোমণি) নিকট মুঞ্চবোধ ব্যাকরণের শেষ অংশ ও জয়কৃষ্ণের সারমঞ্জরী পড়িয়াছিলাম। তাহার পর তিনি আমাকে নৈষধ পড়াইতে আরম্ভ করেন। নৈষধ পড়াইতে গিয়া কাব্যংশই তিনি পড়াইতে চান। ব্যাকরণ বা দর্শনের দিকে তিনি ফিরিয়াও চান না। সেকালের টোলের পণ্ডিতরা অলঙ্কার খুব কমই পড়িতেন। যদি বা দুই একজন পড়িতেন তাঁহারা কাব্য প্রকাশের জগদীশ তর্কালঙ্কারের টীকা পড়িতেন এবং ন্যায়শাস্ত্রের কয়েকটি লইয়াই থাকিতেন” (শাস্ত্রী ১৯৯৫: ১১)। সংস্কৃত কলেজে বহু মূল শাস্ত্রের ও ব্যাখ্যার স্বাদ গ্রহীতা হরপ্রসাদের কাছে এই সীমাবদ্ধতা যে পীড়াদায়ক হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের হয়ে প্রচারে গিয়ে দক্ষিণ ভারতীয় পণ্ডিতদের সংস্কৃত উচ্চারণ শুনে বাংলার টোলের পণ্ডিতদের উচ্চারণ স্মরণ করে তাঁদের উচ্চারণ রীতির প্রতি ঘৃণা বোধ করেন (শাস্ত্রী ১৩২৫ বঙ্গাব্দ: ৩০৬)। মনে রাখতে হবে যে উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু পুনরুত্থানবাদী যে আন্দোলন শুরু হয় তাতেও যে পণ্ডিতরা গুরুত্ব পান তাঁরাও কেউ বাংলার কোন টোলে শিক্ষা পান নি। এই প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনের দুজন পুরোধা পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী ও শশধর তর্কচূড়ামণি উভয়েই বারানসীতে শিক্ষিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বিদ্যাসাগরচরিত গ্রন্থে উল্লেখ করেন “বিদ্যাসাগর যদিচ ব্রাহ্মণ এবং ন্যায়শাস্ত্রও যথোচিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তথাপি যাহাকে বলে কাণ্ডজ্ঞান সেটা তাঁহার যথেষ্ট ছিল। এই কাণ্ডজ্ঞানটি যদি না থাকিত তবে যিনি একসময় ছোলা ও বাতাসা জলপান করিয়া পাঠশিক্ষা করিয়াছিলেন তিনি অকুতোভয়ে চাকরি ছাড়িয়া স্বাধীন জীবিকা অবলম্বন করিয়া জীবনের মধ্যপথে স্বচ্ছল-সচ্ছন্দাবস্থায় উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন না।” (রবীন্দ্রনাথ ১৩৬৫: ৪৩)। ন্যায়শাস্ত্রপাঠী পণ্ডিত যে কাণ্ডজ্ঞানরহিত ব্যক্তি এই সিদ্ধান্ত

সমাজে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই উক্তি তারই প্রমাণ। তাঁদের বিদ্যাচর্চা যে “অতি সূক্ষ্ম তর্কের বাহাদুরীতে ছোটো ভালো, কিন্তু কর্মের পথে গাড়ি লইয়া চলে না” এই ধারণাও উনিশ শতকের শেষভাগে ইংরাজীশিক্ষিত মননে দৃঢ়মূল ছিল। এই ‘পুঁথির বচনের কাছে সহজ স্বাভাবিক বুদ্ধিকে দাসখণ্ড দেওয়া’ ব্যক্তিদের নিয়ে যে বিপুল সংখ্যক বিদ্রূপাত্মক রচনা সমসাময়িক কালে রচিত হয় তা টোলধারীদের বিদ্যাজগতের ও সামাজিক ক্ষেত্রে অবনমনের জাজ্জল্যমান দৃষ্টান্ত।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরও বাংলাদেশে বহু টোল ও চতুষ্পাঠী তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল কিন্তু তাদের অবস্থা কি শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা আমরা জানতে পারি ১৯২৭ সালে প্রকাশিত সংস্কৃত কলেজের রিপোর্টে গীর্ষতি তর্কতীর্থ কর্তৃক সংকলিত গোটা বাংলায় সংস্কৃত কলেজের বৃত্তিভোগী বা অন্যান্য স্থানীয় বৃত্তিভোগী টোল-চতুষ্পাঠীরগুলির তালিকা থেকে। এই আশ্চর্য রিপোর্টটির ব্যাপারে আমরা এখন অতি সংক্ষেপে আলোচনা করব। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড লিটন গভর্নর জেনারেল থাকাকালীন টোলবিভাগীয় উন্নতিসাধন ও নবীকরণের কথা শিক্ষানীতিতে ঘোষিত হয়। সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন বঙ্গদেশীয় যাবতীয় টোলের পরিদর্শক নিযুক্ত হন। ১৮৮৪ সালে সমস্ত টোলগুলিকে এক নূতন উপাধি ব্যবস্থার অধীন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৮৯২-৯৩ সালে পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন বাংলার প্রায় সমস্ত টোলগুলি পরিদর্শন করেন। এরপর নূতন উপাধি পরীক্ষা ব্যবস্থা গৃহীত হয় এবং তিনটি পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থা গৃহীত হয়। ১৮৯৭ সালের পর বাংলা, বিহার ও ওড়িশার সংস্কৃত টোল ও শিক্ষাকেন্দ্রগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সুপারিশক্রমে দ্বিতীয় পরীক্ষা গৃহীত হয়। ১৯০৮ সালের পরে এই পরীক্ষাব্যবস্থা ভারত সরকারের Government Resolution No. 1078 T_9 অনুসারে Board of Sanskrit Examinations এর অধীনে আনা হয়। ১৯১৮ সালে এই সংস্থাই Calcutta Sanskrit Associationএ পরিণত হয় ও পরীক্ষার দায়িত্ব নেয়। ৫০০ জন পণ্ডিত এর সদস্য থাকবেন সিদ্ধান্ত হয় এবং ২০ জন এক্সিকিউটিভ নির্বাচিত হয়ে কাউন্সিল স্থাপিত হয়। ২০ জনের মধ্যে ৬ জন পণ্ডিত কলকাতা, প্রেসিডেন্সী ও বর্ধমান বিভাগকে প্রতিনিধিত্ব করবেন, ৬ জন ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগকে এবং তিনজন আসামের টোলগুলির এই সিদ্ধান্ত হয়। বাকি পাঁচজন হবেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি। এই কাউন্সিল যা ভারত সরকারের দেশীয় ধরণে শিক্ষাব্যবস্থার মুখপাত্র হবে, তার প্রেসিডেন্ট সরকার স্বয়ং নির্বাচন করবেন এবং সেক্রেটারী হবেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এই স্থির হয়। এই ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল পরীক্ষক নিয়োগ, তিনটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা, সংস্কৃত শিক্ষার ক্রমোন্নতি এবং টোলগুলিকে বৃত্তিদানের ব্যাপারে সরকারকে অবহিত করা ইত্যাদি। ১৯২৭ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। ৫০০ জন পণ্ডিতের সমাবেশ একবারও হয়নি। এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে মাত্র দুজন পণ্ডিত সক্রিয় ছিলেন ও বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা একবারও হয়নি (Mukherjee ১৯২৭: ২২-২৩)। এই পরিস্থিতিতে গীর্ষতি তর্কতীর্থের অধীনে যে বোর্ড গঠিত হয় তা বিভিন্ন টোলগুলির অবস্থা পর্যবেক্ষণে নির্দিষ্ট বিবরণপত্র পাঠায়। অনেক পণ্ডিতই এই ফর্ম পূর্ণ করে পাঠান নি। যাঁরা পাঠিয়েছেন ও যাঁরা পাঠাননি তাঁদের সম্পূর্ণকৃত বা অসম্পূর্ণ পত্র গীর্ষতি তর্কতীর্থ ও বোর্ড তাদের রিপোর্টে প্রকাশ করেন। প্রশ্নপত্রে যে ভাগগুলি ছিল সেগুলি হচ্ছে ক্রমিক সংখ্যা, বৃত্তিতালিকায় নির্দিষ্ট সংখ্যা, জেলা, টোলের নাম ও যতদিনের প্রাচীন, অধ্যাপনীয় শাস্ত্র, মোট ছাত্র, উপস্থিত ছাত্র, স্কুল কলেজের ছাত্র, গত তিনবছরের উত্তীর্ণ ছাত্র, গভর্নমেন্ট প্রদত্ত ইম্পিরিয়াল/প্রভিন্সিয়াল বা স্পেশাল বৃত্তি, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড বা মিউনিসিপ্যাল বোর্ড প্রদত্ত বৃত্তি, অপর সাধারণ প্রদত্ত বৃত্তি, অধ্যাপকের নাম, উপাধি, গুরু নিকট অধীত শাস্ত্র ও যতকাল যাবৎ অধ্যাপনা,

কোন শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞা, অধ্যাপকের ব্যয়, অপার ব্যক্তির ব্যয়, ছাত্রের নিজ ব্যয়, টোলের অবস্থা, অভাব, অভিযোগ ও আবশ্যিক সংস্কার। মস্তব্যের ঘরে লেখা হয়েছিল সমর্থক সংখ্যা এবং বিবরণপত্র পূর্ণ করে পাঠিয়েছেন কিনা। প্রেসিডেন্সী বিভাগের মধ্যে কলিকাতায় ১৪টি, চব্বিশ পরগনায় ১২টি, যশোরে ৫টি, খুলনায় ৭ টি, নদীয়ায় ১৪ টি, মুর্শিদাবাদে ৪ টি টোলের এইরূপ আলোচনা হয়েছে। বর্ধমান বিভাগে বর্ধমান জেলায় ৩টি, হুগলীতে ৫ টি, হাওড়া জেলায় ১টি, মেদিনীপুর জেলায় ১১টি, বাঁকুড়ায় ১টি ও বীরভূম জেলায় ৪টি টোল আলোচিত হয়েছে। ঢাকা বিভাগের ঢাকা জেলায় ১৪টি, ফরিদপুর জেলায় ৫টি, বরিশাল জেলায় ৩টি, মৈমনসিংহ জেলায় ৭টি টোল আলোচিত হয়েছে, রাজশাহী বিভাগে রাজশাহী জেলায় ৪টি, বগুড়া জেলায় ২টি, পাবনা জেলায় ৬টি টোল আলোচিত হয়েছে। চট্টগ্রাম বিভাগে চট্টগ্রাম জেলায় ৪ টি, ত্রিপুরা জেলায় ১০টি, নোয়াখালি জেলায় ৪টি টোল কথা আমরা পাচ্ছি। সংস্কৃত কলেজের বৃত্তিভোগী পণ্ডিতের সংখ্যা প্রেসিডেন্সী বিভাগে ৬৫ জন, বর্ধমান বিভাগে ২৭ জন, ঢাকা বিভাগে ১৪ জন ও চট্টগ্রাম বিভাগে ২২ জন। সামগ্রিক রিপোর্টটি আলোচনা করে দেখা যায় যে বর্ধমান-বাঁকুড়া অঞ্চলে টোলগুলির সর্বাধিক দুর্দশা ঘটেছিল। কোলকাতা, ঢাকা ও মৈমনসিংহ বিভাগের টোলগুলির অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো ছিল। কোন কোন সম্পন্ন টোলে একাধিক গুরু ছিলেন। মৈমনসিংহ জেলার একটি টোলে চারজন শিক্ষক ছিলেন। কোলকাতা, বর্ধমান, ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলায় একই গুরুর অধীনে একাধিক জায়গায় টোল দেখতে পাই। সম্ভবত সেগুলি প্রধান ছাত্ররা পরিচালনা করতেন। মাত্র দশ বছরের পুরানো টোলের উল্লেখও আমরা পাই যার অর্থ ১৯১৬-১৭ সাল নাগাদও স্বাধীন টোল প্রতিষ্ঠা হয়েছে। অধ্যাপনীয় বিষয় থেকে আমরা জানতে পারি যে এগুলিতে প্রাচীন ও নব্যন্যায়, স্মৃতি, ব্যাকরণ, কাব্য, বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, ভক্তিশাস্ত্র, মীমাংসা, যোগ, জ্যোতিষ, বৈদ্যকশাস্ত্র এমনকি জৈন দর্শন পর্যন্ত সবই পঠনপাঠন হত। টোলগুলির অভিযোগের ভাষা অত্যন্ত হতাশাবহুল। অনেক টোলই নামমাত্র আছে, উত্তীর্ণ ছাত্র নেই। ছাত্রাবসের ব্যবস্থা নেই। মাসিক বৃত্তিই অন্তত কুড়ি থেকে পঁচিশ টাকা হওয়া প্রয়োজন, সংগৃহীত পুথি রক্ষা করা যাচ্ছে না, বহু বৈদ্যক টোলে আয়ুর্বেদ পাঠদান বন্ধ হয়ে গেছে, টোলবাড়ির দশা জরাজীর্ণ ইত্যাদি অভিযোগে রিপোর্টটি পূর্ণ। কোথাও আবার প্রতিকারের মধ্যে নতুন চতুষ্পাঠী স্থাপন ও ছাত্রদের মধ্যে ধর্মশিক্ষা প্রচারের কথাও বলা হয়েছে। সব মিলিয়ে বাংলার প্রগাঢ় ঐতিহ্যশালী টোল শিক্ষাব্যবস্থার এক অভূতপূর্ব করুণ ও বিপন্ন ছবি পাওয়া যায় এই বিশেষ রিপোর্টটি থেকে (Mukherjee ১৯২৭:৩৯৮-৪৭৯)।

বাংলার টোল শিক্ষার ধারা ও নারীর অবস্থান

টোলগুলিতে নারীর সংখ্যা অতি সামান্যই ছিল। প্রিয়ংবদা দেবী (ষোড়শ শতক), জয়ন্তী দেবী (সপ্তদশ শতক) হট্টা বিদ্যালঙ্কার (অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতক), হট্টা বিদ্যালঙ্কার (অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতক), দ্রবময়ী (ঊনবিংশ শতক) এরূপ কয়েকজন অঙ্গুলীগণ্যা খ্যাতকীর্তি পণ্ডিতার নাম আমরা পাই। এঁরা প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ কন্যা ছিলেন (ব্যতিক্রম হট্টা বিদ্যালঙ্কার) এবং মূলতঃ কাব্য, ব্যাকরণ, পুরাণ ও অলঙ্কার পাঠ করেন। হট্টা বিদ্যালঙ্কার কাশীর পণ্ডিতদের কাছে নব্যন্যায় এবং হট্টা বিদ্যালঙ্কার সরগ্রামবাসী গোকুলানন্দ তর্কালঙ্কারের কাছে নব্যন্যায় ও বৈদ্যক শাস্ত্রও অধ্যয়ন করেন। হট্টা বিদ্যালঙ্কার ও হট্টা বিদ্যালঙ্কার নিজেরা অধ্যাপনা করলেও দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা করতে পারেন নি এবং যে বিদ্যা শিক্ষা করলে হয়ত তাঁরা নারীদের টোলে প্রবেশের পথ কিছুটা সুগম করতে পারতেন সেই স্মৃতি পাঠের অধিকার তাঁরা পুরুষশাসিত সমাজে কোনক্রমেই পান নি (চন্দ্রবর্তী ১৯৯৫ : ৯৪-৯৭)। দ্রবময়ীর শিক্ষাও তাঁর পিতা

চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কারের বেড়াবেড়ি গ্রামের টোলে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ, তার টীকা, অভিধান, সামান্য ন্যায় এবং কাব্যলঙ্কার পাঠের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এই পণ্ডিতাদের প্রভাব স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার ও উন্মোচনে ব্যতিক্রমী হয়েই থেকে যায় এবং এঁদের বিদ্রোহী আচার্য্যগণ যেমন জগদীশ তর্কবাগীশ, গোকুলানন্দ তর্কালঙ্কার, নারায়ণ দাস, ভৈরব বিদ্যাসাগর প্রমুখ তাঁদেরও বৃহৎ ব্রহ্মণ্যতাড়িত সমাজে একান্ত প্রান্তবাসীর বেশী কোন ভূমিকায় নিজেদের অধিষ্ঠিত করতে পারেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে আমরা যেমন চন্দ্রশেখরের মত একজন টোলের পণ্ডিতকে তার শাস্ত্রসমুদ্রে ক্ষর, অক্ষর, স্ফোট, ভূমা, অপৌরুষ্য প্রভৃতি তত্ত্বের অনুসন্ধানে বিভোর দেখি (বঙ্কিমচন্দ্র ১২৯০ বঙ্গাব্দঃ ১৮) আবার পাই গজপতি বিদ্যাধিগগজের মত একজন মেরুদণ্ডহীন মূর্খ টুলো পণ্ডিতের চরিত্রও (বঙ্কিমচন্দ্র ১২৬৭ বঙ্গাব্দঃ ৩৪-৩৫)। তবে বঙ্কিমের টোলের যে দুটি চিত্র সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় সেই দুটিই ছাত্রী। আনন্দমঠে শান্তি ছেলেদের মত মাথা কামাত, ফোঁটা কাটত, চন্দন লেপন করত, কৌঁচা দিয়ে কাপড় পরত এবং যজ্ঞোপবীত গলায় না দিতে পারার দুঃখে কাঁদত। একটু বড় হলে সে একবর্ণ ব্যাকরণ না জেনেও ছাত্রদের সঙ্গে ভট্টি, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও নৈষধচরিতের শ্লোক টীকাসহ মুখস্ত করতে থাকে। এই ঘটনা দেখে শান্তির অধ্যাপক পিতা তাকে ‘যদুবিষ্যতি তদুবিষ্যতি ভাবিয়া’ মুন্ধবোধ অধ্যয়ন করান ও কিছু সাহিত্য পাঠ দেন (বঙ্কিমচন্দ্র ১৩৪৫ বঙ্গাব্দঃ ৫৫-৫৬)। দেবী চৌধুরাণীতে প্রফুল্ল প্রথমে সঙ্গিনী নিশার কাছে বর্ণমালা, হস্তলিপি ও শুভঙ্করী শেখে। তারপর ভবানী ঠাকুর স্বয়ং অধ্যাপনা ভার নেন। প্রফুল্ল অতি দ্রুত ব্যাকরণ অধিগত করে ও তারপর ভট্টিকাব্য ও অভিধান আয়ত্ত করে। এরপর প্রফুল্ল রঘু, কুমার, নৈষধ, শকুন্তলা ইত্যাদি কাব্যপাঠ করে তারপর ভবানী ঠাকুর ন্যায়, সাংখ্য ও বেদান্ত অধ্যয়ন করান। যদিও ষড়দর্শনের এই সকল অধ্যায় তিনি প্রফুল্লকে সামান্যই অধিগত করান। তারপর প্রফুল্লকে গভীরভাবে যোগশাস্ত্রের পাঠ দেন এবং শেষে শ্রীমদভাগবতগীতা শিক্ষা দেন। পাঁচ বছরে শিক্ষা সমাপ্ত হয়। পাঠশালা ও তারপরে টোলের পাঠগ্রহণের এ এক আদর্শ চিত্র। লক্ষণীয় যে বঙ্কিম স্ত্রীলোকের ন্যায়শাস্ত্রে পাঠাধিকার নেই একথা অস্বীকার করেছেন। যদিও তিনি প্রফুল্লকে স্মৃতি পড়ান নি। এর দুটি কারণ থাকতে পারে। প্রথমত তিনি প্রফুল্লকে জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী, চিত্তরঞ্জনী ও শারীরিকী শিক্ষায় যে বিশেষ শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন তাতে স্মৃতিপাঠ তাঁর অপয়োজনীয় মনে হয়েছিল। আবার দুরূহ স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ হয়ত বহু সময়সাপেক্ষ হত। অন্য শিক্ষার সময় কম হয়ে পড়ত। (বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৯১ঃ ৬৫) প্রফুল্লের এই বিদ্যাধ্যয়ন আমাদের মনে পড়ায় সরগ্রাম নিবাসী গোকুলানন্দ তর্কালঙ্কারের কাছে মুণ্ডিতমস্তক, শিখা ও উপবীতধারিণী হটু বিদ্যালঙ্কারের নবন্যায়, অলঙ্কার, কাব্য এবং চরক-শুশ্রূত পাঠের কথা (চন্দ্রবর্তী ১৯৯৫ঃ ৯৬-৯৭)। এই টোলশিক্ষার মাধ্যমে বঙ্কিম অনেকাংশে উপস্থাপন করেন বালিকা বিদ্যালয়ে বা মেম নিযুক্ত করে স্ত্রীশিক্ষার এক বিকল্প পরিপূরক। কিন্তু বলা বাহুল্য প্রফুল্লের ব্যক্তিক জীবনে যোগশাস্ত্র ও গীতা ব্যতীত অন্যান্য সংস্কৃত শিক্ষা কতটুকু প্রয়োজনে এসেছিল তা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়। আনন্দমঠেও সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনে সুশিক্ষিতা এবং আত্মসংযমের পাঠে দীক্ষিতা শান্তির সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে ‘আনন্দ’ সন্তানরা সর্বদাই শশব্যস্ত থাকে। সংস্কৃত শিক্ষা শান্তিকে কিছু বুদ্ধিদীপ্ত কথোপকথনে দক্ষতা দান করা ছাড়া আর কোন উপকার সাধিত করে তা ধরা যায় না। অর্থাৎ বঙ্কিমচিত্রিত নারীর টোলের শিক্ষার ক্ষেত্রটির প্রায় কোন প্রায়োগিক দিক নেই। সমস্ত সন্ন্যাসজীবনে জীবানন্দের একটি পুথি প্রদীপালোকে পড়তে মাত্র একবারই দেখা যায় নবীনানন্দবেশিনী শান্তিকে। বঙ্কিম রচিত জ্ঞানার্জনী, চিত্তরঞ্জনী, কার্যকারিণী ও শারীরিকী শিক্ষার যে বিপুল আদর্শ তার সাথে এই শিক্ষার সীমাবদ্ধতা কতটা সঙ্গতিপূর্ণ তা চিন্তাযোগ্য। বাংলা সাহিত্যে নারীর

টোল শিক্ষার আর কোন বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ নেই। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীকান্ত তৃতীয় পর্বে দেখা যায় সুন্দা নামে এক টোল পণ্ডিতের গৃহীনিকে যিনি তাঁর সন্ন্যাসী পিতার কাছে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন ও যাঁর স্বামী গৃহে কালিদাসের কাব্য এবং ন্যায়-স্মৃতির বিচার চলে। উনিশ শতকের শেষপাদে আমরা দেখতে পাই কিভাবে পণ্ডিতা রমাবাসী এর পিতা অনন্ত শাস্ত্রী ডোংগড়ে তাঁর স্ত্রী ও কন্যাকে সংস্কৃতে সুশিক্ষিতা করে তোলার জন্য মহারাষ্ট্রে স্বজাতি ও স্বগ্রাম চ্যুত হয়ে গঙ্গামূল অরণ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। এহেন পরিস্থিতিতে টোল ধারার শিক্ষায় নারীর অস্তিত্ব কতটা আণুবীক্ষণিক ছিল বলাই বাহুল্য।

বিংশ শতকের শেষপাদে রচিত নারায়ণ সান্যালের রূপমঞ্জরী উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে হটী বিদ্যালয়কারের বিদ্যাশিক্ষা ও শিক্ষণের এক বাস্তবতাসূচী কাল্পনিক চিত্র যেখানে নারীর শিক্ষামূলক বিতর্কে স্মৃতি সাহিত্য অংশটিই পরিত্যক্ত হয়ে যায়। ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত অমিয়ভূষণ মজুমদারের নয়নতারা উপন্যাসে সংস্কৃত সামান্য শিক্ষা করেই নায়িকাকে মহাভারত বিচারে প্রবৃত্ত দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র পরবর্তী যুগে টোলের পণ্ডিতদের এবং অনেক সময় তাঁদের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের চিত্র থাকলেও টোলের পঠনপাঠন পদ্ধতির উল্লেখ প্রায় নেই। এমনকি তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাতেও উল্লেখ নেই। অনেকেই টোলের শিক্ষারীতি বলতে গিয়ে পাঠশালার শিক্ষারীতি বর্ণনা করেছেন। টোলশিক্ষার এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অনুপস্থিতি সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার সমাজজীবন থেকে প্রবল বিচ্ছিন্নতার স্বাক্ষর দেয়। আর টোলে নারীশিক্ষার বর্ণনায় যে এ সীমাবদ্ধতা অধিকতর প্রকট হবে তা বলাই বাহুল্য।

উপসংহার

টোলশিক্ষাব্যবস্থা বাংলার ঐতিহ্যশালী সংস্কৃত শিক্ষাব্যবস্থার নিঃসন্দেহে এক সুদৃঢ় মাধ্যম ছিল। প্রাক ঔপনিবেশিক যুগে বাংলার দেশজ শিক্ষাধারার প্রধান মেরুদণ্ডই ছিল টোল ও মজুব। কিন্তু ঔপনিবেশিক যুগে নূতন জ্ঞানচর্চার ধারার বিকাশ ও জীবন সংগ্রামের ক্ষেত্রে তারই প্রধান কার্যকারিণী ভূমিকা টোলের সনাতন জ্ঞানচর্চার ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন ও ক্রমেক্রমে বিতৃষ্ণ করে তোলে। মেকলের প্রশ্ন্যপ্রাপ্ত কোলকাতার ইংরাজী শিক্ষিত ভদ্রলোক যুবসমাজ সংস্কৃতকে দেখতেন উন্মাসিক দৃষ্টিতে। হিন্দু বা প্রেসিডেন্সী কলেজে সংস্কৃত আদৌ পড়ান হত না যেমন হত না অন্য অনেক কলেজেই। কলিকাতা ইউনিভার্সিটিতে সংস্কৃত ছিল ঐচ্ছিক বিষয়। চার্লস উড ডেসপ্যাচ থেকে স্যাডলার কমিশন পর্যন্ত বিভিন্ন শিক্ষানীতিতেই সংস্কৃতচর্চা ক্রমাগত অবহেলিত হয়ে চলেছিল। Brian A. Hatcher তাঁর অসাধারণ রচনায় এই পণ্ডিতসমাজের ক্রমবিস্মৃতির যে ছবি তুলে ধরেছেন তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। কলকাতায় Asiatic Society থেকে Pune Bhandarkar Oriental Research Instituteতে যেখানে প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যা বা ইতিহাসচর্চার সাথে সাথে সংস্কৃতচর্চা হত সেখানে সংস্কৃত আলোচনা বা পাঠ দিতেন ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিরা যাঁদের সংস্কৃত শিক্ষা হয়েছিল পুরোপুরি কলেজ-ইউনিভার্সিটির ধারায় (Rajendralal Mitra 1885-11:30)। রাজেন্দ্রলাল মিত্র থেকে D.R. Bhandarkar প্রমুখ যে ধারার বাহক। এর ফলে টোল কেন্দ্রিক সংস্কৃতচর্চার ধারা যা পদ্ধতি, গুণ, উদ্দেশ্য বা দৃষ্টিভঙ্গীগতভাবে এই ঔপনিবেশিক এবং আধুনিক bourgeois মননচালিত Oriental জ্ঞানচর্চা থেকে পৃথক ছিল তার ধারাটি ক্রমশ শুকিয়ে যায়। Oriental Research বা Indology কিম্বা প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস চর্চায় যে সনাতন সংস্কৃত জ্ঞানের ধারার বাহকদের এই চূড়ান্ত অনুপস্থিতি সমগ্র প্রাচ্যানুসন্ধান discourseটিরই খণ্ডিত অসম্পূর্ণতাকে দেখিয়েদেয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কমলাকান্তের

দপ্তরে ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের হাট করা দেখাতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের যে ছবি তুলে ধরেন সেখানে পণ্ডিতরা বুনা নারিকেল বিক্রি করবার জন্য নিজেদের অভাব অভিযোগের সানুনাসিক বর্ণনা করে ক্রেতাদের নারিকেল কেনার অনুনয় করতে থাকেন। তাঁদের বিচিত্র বর্ণনা শুনে কমলাকান্ত প্রশ্ন করে যে নারিকেল ছাড়ানোর জন্য তাঁদের কাছে দা আছে কিনা। তদুত্তরে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা বলেন ‘আমরা দা রাখি না, কামড়াইয়া ছোবড়া ছাড়াই’ যা শুনে কমলাকান্তের মত খরিদদাররা বিমুখ হয়। এমন সময় পাশের দোকান থেকে সাহেব পসারীরা এসে বুনা নারিকেল কেড়ে নিয়ে যান এবং পণ্ডিতরা মুক্তকণ্ঠ হয়ে পলায়ন করতে থাকেন। সাহেবরা উন্নত বিলাতী অস্ত্রে নারিকেল ভেঙে আহার করতে থাকেন এবং কমলাকান্তের প্রশ্নের উত্তরে জানান যে এই পদ্ধতির নাম ‘Asiatic Research. বঙ্কিম রচিত এই রঙ্গদৃশ্য প্রাচীনপন্থী ‘আধুনিক অস্ত্রহীন’ টোলধারী ভট্টাচার্য্যদের থেকে পাশ্চাত্য পণ্ডিত এবং তাঁদের শিষ্য ভারতীয়দের সংস্কৃতচর্চার জগতে স্থানান্তরিত হয়ে যাওয়া ও তার নীচে দেশজ ধারাটির নিমজ্জনের এক স্পষ্ট চিত্র (বঙ্কিমচন্দ্র ১২৯২ বঙ্গাব্দঃ ১২৫-৩০)। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও যে এই ইউরোপীয় পদ্ধতির ফসল ও সমর্থক তা বোঝা যায় বঙ্গদর্শনের জন্য কালিদাসের উপর রচিত প্রবন্ধকে জার্মান পণ্ডিতের সাথে তুলনা করেন এবং প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য বিশ্লেষণ যে জার্মান শৈলীতে করতে হবে তাকে মান্যতা দেন (শাস্ত্রী ১৯৯৫ঃ ১২)। এর পাশাপাশি মুসলমান সমাজে ইংরাজী শিক্ষা অনেক পরে প্রচলিত হওয়ায় টোলের তুলনায় মস্তবগুলি দীর্ঘতর পরমায়ু পায়। অপরদিকে টোলের ভট্টাচার্য্যরা আধুনিক যুগ থেকে মুখ ফিরিয়ে তাঁদের জ্ঞানধন অর্গলবদ্ধ করে রাখেন। আর অপরদিকে বৃত্তি-বিদ্যালোভী অসাধু ব্রাহ্মণরা নামে মাত্র চতুষ্পাঠী রাখে ও শাস্ত্রালোচনা নিয়ে মাথাই ঘামায় না। উনিশ শতকের শেষপাদ থেকেই কয়েকটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে এই সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাটি প্রায় চূর্ণ হয়ে যায়। টোল ব্যবস্থার মৃতপ্রায় যে অংশটি সংস্কৃত কলেজের appendage হয়ে থাকতে পারে এবং ভাটপাড়া ও নবদ্বীপকেন্দ্রিক কিছু স্বল্পছাত্র টোল টিকে যায় তাই এই একদা গৌরবোজ্জ্বল শিক্ষাধারার শেষ মুমূর্ষু অস্তিত্বের ধারকরূপে বর্তমান থাকে।

গ্রন্থস্বর্ণাং:

বাংলা সূত্রাদি

- * আচার্য্য, পরমেশ, ২০০৯, *বাংলার দেশজ শিক্ষার ধারা*, কলকাতাঃ অনুষ্ঠাপ প্রকাশনী।
- * আলী, সৈয়দ মুজতবা, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাসমগ্র, দশম খণ্ড, কলিকাতাঃ মিত্র ও ঘোষ প্রকাশন।
- * কবিরত্ন, হরিশচন্দ্র, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ, ভাদ্র সংখ্যা, ‘সেকালের সংস্কৃত কলেজ’ দ্রষ্টব্য প্রবাসী, পৃষ্ঠা ৬৪৪-৬৫২।
- * কবিরত্ন, হরিশচন্দ্র, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ, আশ্বিন সংখ্যা, ‘সেকালের সংস্কৃত কলেজ’ দ্রষ্টব্য প্রবাসী, পৃষ্ঠা ৮৯০-৯৭।
- * গুপ্ত, বিপিনবিহারী, ১৩২০ বঙ্গাব্দ, পুরাতন প্রসঙ্গ, কলিকাতা।
- * ঘোষ, তপোব্রত, ২০২২, *যেভাবে বঙ্কিম পড়ি*, কলিকাতা : তবু প্রকাশন।
- * চক্রবর্তী, অলোককুমার, ২০১৫ সংস্করণ, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, কলিকাতাঃ গ্রন্থমিত্র।

- * চক্রবর্তী, শ্রীজনাব্দ, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ, ‘স্মৃতিভাৱে’, কলিকাতাঃ জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স লিমিটেড।
- * চক্রবর্তী,রমাকান্ত, ১৯৯৬, বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মঃ একটি ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন, কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স।
- * চক্রবর্তী, শ্যামলী, ১৯৯৫, ‘বঙ্কিমচন্দ্রের নারীশিক্ষা ভাবনায় টোল’ দ্রষ্টব্য পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা বঙ্কিম সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৯৩-১০৫।
- * চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, আনন্দমঠ (সম্পা) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, কলিকাতাঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।
- * চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, ১২৯২ বঙ্গাব্দ, কমলাকান্ত, কলিকাতা।
- * চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, ১২৯১ বঙ্গাব্দ, দেবী চৌধুরাণী, কলিকাতা।
- * চট্টোপাধ্যায়,রামানন্দ, ১৮৯২, ‘প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনী ও কবিতাবলী’, কলিকাতা।
- * জয়ানন্দ, ২০১৬ সংস্করণ, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল (সম্পা) বিমানবিহারী মজুমদার ও সুখময় মুখোপাধ্যায়, কলিকাতাঃ এশিয়াটিক সোসাইটি।
- * ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ, বিদ্যাসাগরচরিত, কলিকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।
- * তর্কভূষণ, তারাদান, ১৩০০ বঙ্গাব্দ, তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবনী ও সংস্কৃত বিদ্যার উন্নতি, কলিকাতাঃ ব্রাহ্ম মিশন প্রেস।
- * দাস, বৃন্দাবন, ১৮৫৪, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীরামপুর,জ্ঞানোৎসাহদয় যন্ত্র।
- * পিপলাই, বিপ্রদাস, ২০০২, বিপ্রদাস পিপলাইএর মনসামঙ্গল (সম্পা) অচিন্ত্য বিশ্বাস, কলিকাতাঃ রত্না প্রকাশনী।
- * বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, ‘জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন’ দ্রষ্টব্য সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৪৬ বর্ষ প্রথম সংখ্যা।
- * বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, ‘সেকালের সংস্কৃত কলেজ’ দ্রষ্টব্য সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৪৬ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা।
- * বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, ‘সেকালের সংস্কৃত কলেজ’ দ্রষ্টব্য সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৪৭ বর্ষ প্রথম সংখ্যা।
- * বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, ‘সেকালের সংস্কৃত কলেজ’ দ্রষ্টব্য সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৪৭ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা।
- * বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, ‘সেকালের সংস্কৃত কলেজ’ দ্রষ্টব্য সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৪৭ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা।
- * বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, ‘সেকালের সংস্কৃত কলেজ’ দ্রষ্টব্য সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৪৭ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা।
- * বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, ‘সেকালের সংস্কৃত কলেজ’ দ্রষ্টব্য সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৪৮ বর্ষ প্রথম সংখ্যা।
- * বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, ‘সেকালের সংস্কৃত কলেজ’ দ্রষ্টব্য সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৪৮ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা।
- * বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, ‘সেকালের সংস্কৃত কলেজ’ দ্রষ্টব্য সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৪৮ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা।
- * বন্দ্যোপাধ্যায়,বিভূতিভূষণ, ২০১১, ‘অনুবর্তন’ দ্রষ্টব্য বিভূতি উপন্যাসসমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড, কামিনী প্রকাশণ।
- * বন্দ্যোপাধ্যায়,বিভূতিভূষণ, ২০১০, ‘পথের পাঁচালী’ দ্রষ্টব্য বিভূতি উপন্যাসসমগ্র প্রথম খণ্ড, কামিনী প্রকাশণ।
- * বন্দ্যোপাধ্যায় হরিশচরণ, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ, বঙ্গীয় শব্দকোষ দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতাঃ বিশ্বকোষ প্রেস।
- * বিদ্যারত্ন, গিরিশচন্দ্র ও হরিশচন্দ্র কবিরত্ন, ১৯০৯, ‘গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের জীবনচরিত’, কলিকাতাঃ মণিকা প্রেস।

ঔপনিবেশিক বাংলায় টোলকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার বিবর্তন : সংস্কৃতচর্চার বহুমাত্রিকতা এবং ‘আধুনিক’ বাঙালী মনন

- * বিদ্যারত্ন, দেবব্রত, ১৯৫২, জীবনকথাঃ পূজ্যপাদ আচার্য্য সত্যব্রত সামশ্রমী, কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
- * বিদ্যারত্ন, শম্ভুচন্দ্র, ১৩০০ বঙ্গাব্দ, পণ্ডিতকুলতিলক মহাত্মা তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবনচরিত, কলিকাতাঃ ইংরাজী-সংস্কৃত যন্ত্র।
- * বিদ্যারত্ন, শম্ভুচন্দ্র, ১২৯৮ বঙ্গাব্দ, বিদ্যাসাগর জীবনচরিত, কলিকাতাঃ ইংরেজী-সংস্কৃত যন্ত্র।
- * বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র, ১২৮০ বঙ্গাব্দ, আবার অতি অল্প হইল, কলিকাতাঃ সংস্কৃত যন্ত্র।
- * বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র, ১২৯১ বঙ্গাব্দ, ব্রজবিলাস, কলিকাতাঃ এস.কে.লাহিড়ী এণ্ড কোং।
- * বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র, ২০০৬ খ্রীষ্টাব্দ, ‘বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব দ্বিতীয় পর্ব’ দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতাঃ সাহিত্যম, পৃষ্ঠা ১০১৭-১১৫৮।
- * বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র, ২০০৫ খ্রীষ্টাব্দ, ‘বিদ্যাসাগরচরিত’ দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর রচনাবলী প্রথম খণ্ড, কলিকাতাঃ সাহিত্যম, পৃষ্ঠা ২১-৩৭।
- * ভট্টাচার্য্য, গোপীকামোহন, ১৯৬১, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডঃ ১৮৫৮-১৮৯৫, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ।
- * ভট্টাচার্য্য, দীনেশচন্দ্র, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান প্রথম খণ্ডঃ বঙ্গ নব্যন্যায়চর্চা, কলিকাতাঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।
- * ভট্টাচার্য্য, বিমানচন্দ্র, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ, সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা, কলিকাতাঃ বিশ্বোদয় লাইব্রেরী।
- * ভট্টাচার্য্য, হেমচন্দ্র, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, বঙ্গীয় সংস্কৃত অধ্যাপক জীবনী, কলিকাতাঃ নবীন প্রকাশক।
- * যতী, রামানন্দ, ১৯৬৯, চণ্ডীমঙ্গল (সম্পা) অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়, কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
- * রায়, দীনেন্দ্রকুমার, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ, সেকালের স্মৃতি, কলিকাতাঃ নাভানা।
- * রায়, নীহাররঞ্জন, ১৩৫৬, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ সংস্করণ, বাঙ্গালীর ইতিহাসঃ আদি পর্ব, কলিকাতাঃ দেজ পাবলিকেশন।
- * শাস্ত্রী, বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য, ২০১১, ‘রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়’ দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রসংলাপকণিকা ও অন্যান্য রচনা, কলিকাতাঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, পৃষ্ঠা ৩৯-৫৩।
- * শাস্ত্রী, শিবনাথ, ১৩২৫ বঙ্গাব্দ, আত্মচরিত, কলিকাতাঃ প্রবাসী কার্য্যালয়।
- * শাস্ত্রী, শিবনাথ, ১৯২৩, যুগান্তর, কলিকাতাঃ ত্রান্তিক প্রেস।
- * শাস্ত্রী, শিবনাথ, ১৯০৪, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, কলিকাতাঃ এস.আর.লাহিড়ী প্রকাশণ।
- * শাস্ত্রী হরপ্রসাদ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, ‘বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়’ দ্রষ্টব্য পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা বঙ্কিম সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৮-১২।
- * সান্যাল, নারায়ণ, রূপমঞ্জরী, ১৯৯০, কলিকাতাঃ দেজ পাবলিকেশনস।
- * সেন, দীনেশচন্দ্র, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য, কলিকাতাঃ জিজ্ঞাসা।

English Sources

Chakravarti, Ramakanta, 1985, *Vaisnavism in Bengal 1486-1900*– Calcutta-Sanskrit Pustak Bhandar.

- General Reports on the Public Instructions in the Lower Province of the Bengal Presidency For 1844-45*, Calcutta, Military Orphan Press.
- General Reports on the Public Instructions in the Lower Province of the Bengal Presidency For 1845-46*.
- General Reports on the Public Instructions in the Lower Province of the Bengal Presidency*. From 1st Oct 1849 to 30th Sept 1850.
- General Reports on the Public Instructions in the Lower Province of the Bengal Presidency*. From 1st Oct 1850 to 30th Sept 1851.
- Hatcher, Brian Allison, 1996, *Idioms of Improvement, Vidyasagar and the Cultural Encounter in Bengal*, Oxford. Oxford University Press.
- Hatcher, Brian Allison, 'What's Become of the Pandit' Rethinking the Sanskrit Scholars in Colonial Bengal', in *Modern Asian Studies*, 39 3(2005), 683-723.
- Kopf, David, 1969, *British Orientalism and the Bengal Renaissance. The Dynamics of the Modernization of Bengal 1773-1865*, Calcutta, Firma K. L. Mukhopadhyay.
- Long-R.J. (ed). 1868, *Adam Reports on Vernacular Education in Bengal and Behar Submitted to government in 1835, 1836 and 1838, with a Brief Review of Its Past and Present Condition*, Calcutta. Home Secretariat Press.
- Mcguire, John, 1983, *The Making of A Colonial Mind- A Quantitative Study of the Bhadrolok in Calcutta*, Canberra, Anu.
- Michaels, Axel (ed.), 2001, *The Pandit, Traditional Scholarship in India*, New Delhi, Manohar.
- Mitra, Rajendralal (ed.), 1885, *Centenary Review of Asiatic Society of Bengal from 1784 to 1883*, Calcutta, Asiatic Society and Thacker. Spink and Co.
- Mukherjee, Adityanath (ed.), 1928, *Report on the Sanskrit College Committee 1927*, Calcutta- Bengal Secretariat Press.

লেখক পরিচিতি:

পিএইচডি গবেষক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগ
মেল আইডিঃ pritamgoswami1994@gmail.com